এক যে ছিল
ভোঁদড়
হিমানীশ গোস্বামী

এক যে ছিল ভোঁদড়

হিমানীশ গোস্বামী

মুখার্জী ব্রাদার্স। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৯০

প্রকাশক
সুকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
অহিভূষণ মালিক

মূল্য ঃ আট টাকা

ঝুমকি, ঝুমু ও রানাকে

মশাই

এক জঙ্গলে এক ভোঁদড় থাকত। কাছেই ছিল একটা জলা। জলায় ছিল মাছ। ভোঁদড় মাছ খেত। মনের সুখে চান করত জলার ঠাণ্ডা জলে। ভোঁদড়টা চান করে মাছ-টাছ খেয়ে কাঠবিড়াল আর কাঠ-বিড়ালীদের সঙ্গে খেলত। মাঝে মাঝে প্রজাপতি ধরবার জন্য ছোটাছুটি করত। তারপর ক্লান্ত হয়ে সে এসে তার গর্তে ঢুকে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো। তার বাবা মা ভাই বোন কেউ ছিল না। ভোঁদড়টা যখন খুব ছোট ছিল তখনই তাদের বাবা মা কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

একদিন ভোঁদড়টা চান-টান করে বেশ করে গাটা শুকিয়ে একটা পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খেতে খেতে তার ঘুম পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি এসে নিজের গর্তে ঢুকতে গিয়েই তার মনে হল তার গর্ত থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে থেমে গেল, আর উঁকি মেরে দেখল তাদের জঙ্গলের সবচেয়ে শয়তান শেয়াল হুয়াজী দিব্যি তার গর্তের মধ্যে শুয়ে রয়েছে। আর তার মুখে লেগে রয়েছে একফালি হাসি।

ভোঁদড়ের খুব রাগ হল। সে বলল, হুয়াজী হুয়াজী আপনি আমার গর্তে রয়েছেন কেন, ছেড়ে চলে যান আমি ঢুকব।

তার উত্তরে হুয়াজী বলল, ক্যা—ক্যা—ক্যা—ক্যা—হুয়া!

ভোঁদড় তার মানে বুঝতে পারল না। সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলল, হুয়াজী, হুয়াজী আমি গরীব ভোঁদড়, আমার একটাই গর্ত—ঐ গর্তটা ছেড়ে দিন!

হুয়াজী তা শুনে আবার বলল, ক্যা—ক্যা—ক্যা—ক্যা—হুয়া! বলে আবার পাশ ফিরে শুল।

তখন ভোঁদড়ের হল ভারি মুশকিল।

সে ভাবল একটা গর্ত হাতছাড়া হয়ে গেল, এবারে তো আমার একটা নতুন গর্ত খুঁজতে হয়। এই ভেবে সে জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা
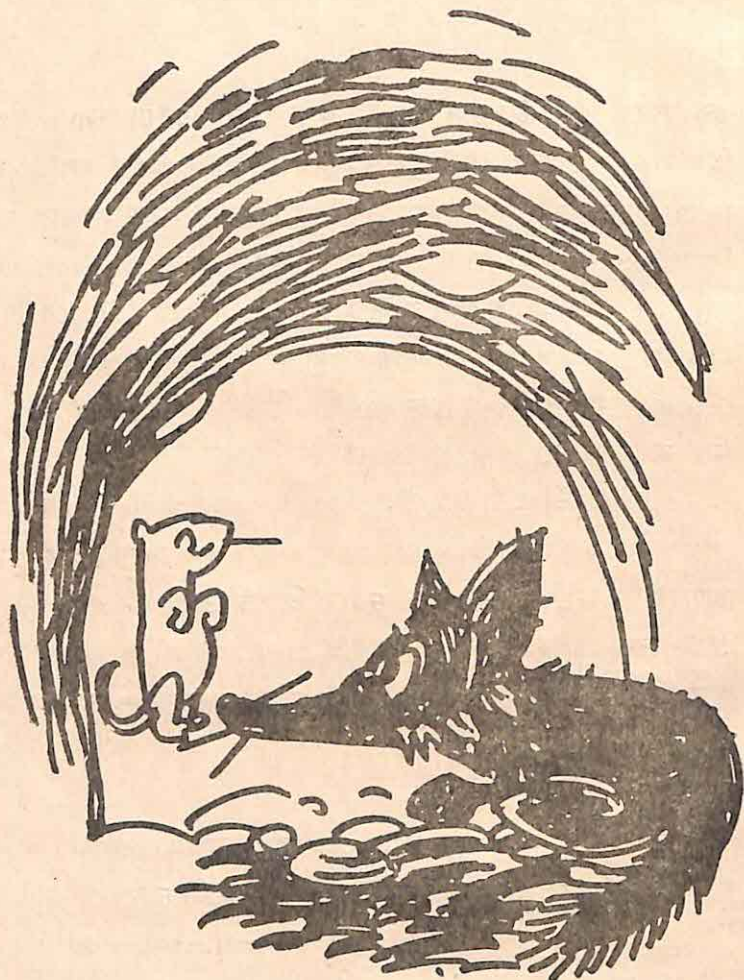
ক্যা, ক্যা, ক্যা, ক্যা—হুয়া

দূর গেল। কিন্তু কোথাও কোনো গর্ত দেখতে পেল না! সে তখন

আরও অনেক দূর গেল তখন সে দেখতে পেল একটা কোকিল ডাকছে—কু—কু—কু !!

ভোঁদড়টা তখন বলল, ও কোকিল ভাই ও কোকিল ভাই আমার একটা কথা শুনবে ?

কোকিল একথায় কোনো জবাব না দিয়ে ডাকতে লাগল কু—কু—কু !!

ভোঁদড় বলল, ও কোকিল ভাই ও কোকিল ভাই আমার বড় বিপদ ! কোকিল কোনো কথা না শুনে কেবল ডাকতেই লাগল।

তখন ভোঁদড়ের ভীষণ রাগ হল। সে বলল, কোকিল আমার কথা শুনল না। একে আমি ভয়ানক শাস্তি দেব। কিন্তু আমার গর্ত—সেটা যে শেয়াল গিয়ে দখল করেছে। আমার যে একটা গর্ত ভয়ানক দরকার। একটা গর্ত পাই কোথায় ?

ভোঁদড় তখন চলতে লাগল আবার বনপথ ধরে। কিছুক্ষণ পর বন শেষ হয়ে গেল। এবারে প্রান্তর এসে পড়ল। প্রান্তরের একদিকে চমৎকার একটা রামধনু উঠেছে দেখে খুব বিস্মিতভাবে সে রামধনুর দিকে তাকিয়ে রইল। ভোঁদড় এর আগে কখনও রামধনু দেখেনি। সে ঐ রঙীন জিনিসটার নামও জানত না। সে মনে মনে বলল, আমার একটা ঐ রকম জিনিস চাই। কিন্তু তার চাইতে বেশি চাই আমি কোকিলটাকে শাস্তি দিতে, আর সবচেয়ে বেশি যা চাই তা হল একটা গর্ত।

মাঠের একপাশে অনেকগুলো গরু চরছে দেখে সে লাফিয়ে লাফিয়ে একটা গরুর কাছে গেল।

গিয়ে বলল, গরু মহাশয়া গরু মহাশয়া আমার একটা কথা শুনবেন ?

গরু কথার জবাব না দিয়ে আপন মনে ঘাস খেতে লাগল।

ভোঁদড় বলল, এ গরুটা কালা নাকি ? কথা যে একেবারেই

শুনতে পাচ্ছে না। সে তখন খুব জোর চেঁচিয়ে বলল, গরু মহাশয়া, গরু মহাশয়া আমার একটা কথা শুনুন।

কিন্তু গরু কোনো কথা শুনল না। ভোঁদড় খুব রেগে গেল। সে বলল, আমি গরুটার এমন শাস্তি দেব যে সে খুব কাঁদবে। এই বলে সে রামধনুর দিকে তাকাল। রামধনুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, ঐ জিনিসটা আমার চাই, আর চাই কোকিলকে শাস্তি দিতে, তার চাইতে বেশি চাই গরুকে শাস্তি দিতে—কিন্তু সবচেয়ে বেশি চাই আমি একটা গর্ত !

এই সব কথা ভাবছে আর ভোঁদড় চলছে। চলছে তো চলছেই। চলতে চলতে সে চলে এলো কদমগাছের দেশে। সেখানে সবই কদমগাছ। আর কোনো গাছ নেই। কদমগাছে বসে ছিল একটা প্যাঁচা। প্যাঁচা ডাকছিল হুম থুম থুম হুম ! হুম থুম থুম হুম ! হুম থুম থুম হুম !

ভোঁদড় বলল, ও প্যাঁচা ভাই, ও প্যাঁচা ভাই আমার ভারি বিপদ হয়েছে।

প্যাঁচা কোনো উত্তর দিল না। কেবল বলল, হুম থুম থুম হুম ! হুম থুম থুম হুম ! হুম থুম থুম হুম !

ভোঁদড় বলল, এ তো মহা অসভ্য পাখি ! আমি এত করে বলছি আমার বিপদ হয়েছে তা এ একেবারেই তা শুনছে না ! ভোঁদড় তখন খুব জোরে চিৎকার করে বলল, ও প্যাঁচা ভাই, ও প্যাঁচা ভাই, আমার ভারি বিপদ—একবার কথাটা শোনই না !

প্যাঁচা তবু কথা শুনল না দেখে ভোঁদড় বলল, আমি যদি সুযোগ পাই তো প্যাঁচাটাকে শেষ করে দেব। বলে সে চলতে আরম্ভ করল।

চলতে চলতে চলতে মাটির রঙ কত বদলাতে লাগল। বাঘের মত কালো-হলুদ মাটি, কেঁচোর মত ছাই রঙের মাটি, কালো সাদা মেশানো মাটি, লাল মাটি কত রকম মাটি, আর কত রকম আঁকা

বাঁকা রাস্তা। সে সব রাস্তা শেষ হয়ে গেলে সে দেখে একটা বুড়ো মানুষ একটা উঁচু দেয়ালের কাছে বসে বসে তামাক খাচ্ছে।

হুম—থুম—থুম

ভোঁদড় বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, বুড়ো, ও বুড়ো ?

বুড়ো কোনো জবাব না দিয়ে কেবলই তামাক টানতে লাগল।

ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক করে তার দিব্যি আওয়াজ হতে লাগল আর কেমন চমৎকার গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

ভোঁদড় সেই বাতাস শুঁকে দেখল। তার বড় ভাল লাগল। কিন্তু বুড়ো তার কথায় কান না দেওয়ায় ভোঁদড় ভারি চটে গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, ও বুড়ো—বুড়ো, আমি যে তোমাকে ডাকছি !

কিন্তু বুড়ো কানেই শুনতে পায় না ভাল করে। সে বলল, তুমি কে হে আমার কাছে ঘুর-ঘুর করছ ?

ভোঁদড় বলল, আমি ভোঁদড়।

বুড়ো বলল, কি বললে, তুমি চোর ? তা আমার কাছে চুরি করতে এসে থাকলে তুমি মহা ভুল করেছ—আমার এই হুঁকো কলকে ছাড়া আর কিছু নেই।

ভোঁদড় বলল, আমি চোর কেন হব—আমি ভোঁদড়।

বুড়ো বলল, বাঁদর ? যত সব বাজে কথা। আমি তো দেখছি তুমি একটা ভোঁদড়।

ভোঁদড় বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভোঁদড়ই বটে !

বুড়ো বলল, তুমি ভোঁদড় তাই বল, বটে কেন ? তুমি কি কেবল বটে ভোঁদড়, তাহলে তুমি তালগাছে কি ?

ভোঁদড় বলল, আমি তাল গাছেও ভোঁদড়।

বুড়ো বলল, আহা তুমি এত মিথ্যে কথা কও কেন—তাল গাছে কি করে তুমি বাদুড় হও।

ভোঁদড় বলল, আহা বাদুড় হব কেন। তালগাছেও আমি ভোঁদড়।

বুড়ো বলল, তাই বল। কিন্তু অত জোরে পালালে কেন ?

ভোঁদড় বলল, পালালাম কোথায় ?

বুড়ো দুবার ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টেনে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, একটু আগেই তো বললে তুমি ভোঁ দৌড় দিয়েছ।

ভোঁদড় বলল, আমি তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম। আমার কথা যে বুড়োর কানেই ঢোকে না ?

বুড়ো তখন দুকান থেকে দুটো ছিপি বার করে বলল, এবার বল দেখি কী সব যাচ্ছেতাই কথা বলছিলে ? তুমি তালগাছ থেকে নেমে ভোঁ দৌড় দিয়েছিলে কেন ?

ভোঁদড় বলল, আমি তালগাছ থেকে নেমে ভোঁ দৌড় দিয়েছি কখন বললাম ?

বুড়ো বলল, তুমি কিছু মনে রাখতে পার না দেখছি। যাই হক তুমি আমার কাছে কেন এসেছ তা তো বলছ না ?

ভোঁদড় বলল, আমার ভীষণ দুঃখ। আমার একটা গর্ত ছিল। সেটা শেয়াল এসে দখল করে নিয়েছে। আমার তাই একটা গর্ত দরকার। আপনি কি আমাকে একটা ভাল মত গর্ত দিতে পারবেন ?

বুড়ো ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানতে লাগল আর মাথা চুলকোতে লাগল। বলল, এই তোমার দুঃখ ? মাত্র একটা গর্তের জন্য তুমি দুঃখ করছ ?

ভোঁদড় বলল, আমার একটিই গর্ত ছিল, সেটা শেয়ালে নিয়ে গিয়েছে দুঃখ হবে না ?

বুড়ো বলল, তবে তুমি তো খুবই ভাগ্যবান হে খুবই ভাগ্যবান !

ভোঁদড় বলল, কেন আমি ভাগ্যবান কেন ?

বুড়ো বলল, তবে তোমাকে একটা গল্প বলি, শোনো। তোমার সময় আছে ত ?

ভোঁদড় বলল, কী জানি সময় আছে কিনা। তবে আমার খিদে আর তেষ্টা পেয়েছে।

বুড়ো বলল, দাঁড়াও তাহলে। বলে দোকান থেকে তার জন্য এনে দিল একথালা ভাত আর মাছের ঝোল।

ভোঁদড় খুব তৃপ্তি করে খেয়ে বলল, এবার গল্পটা বলুন।

বুড়ো বলল, হ্যাঁ বলি। এই বলে কলকের সব ছাইটাই উলটে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তামাক সাজল, আর চকমকি পাথর দিয়ে কলকে ধরিয়ে হুঁকোর উপর রেখে বলতে শুরু করল :

সে অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। তখন সূর্যের রঙ এমন ঘোলাটে ছিল না আর গাছপালার রঙ ছিল সত্যিকারের কাঁচা সবুজ। জল ছিল পরিষ্কার, আকাশের রঙ ছিল গাঢ় নীল। বেশির ভাগ
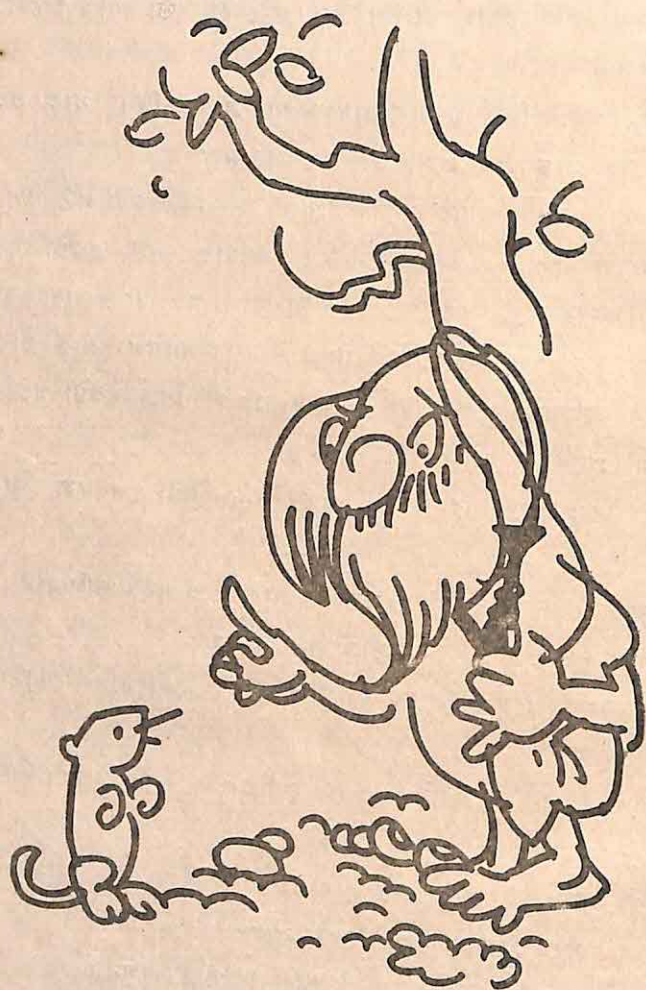
মানুষের মন ছিল খোলামেলা। অনেক মানুষ জঙ্গলের পশুদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকত।

ভোঁদড় জিজ্ঞেস করল, সে সময় শেয়ালরাও ছিল ?

বুড়ো বলল, হ্যাঁ ছিলই তো।

ভোঁদড় বলল, তারা ভোঁদড়ের গর্ত নিয়ে নিত না ?

বুড়ো বলল, তখন তো আজকালকার মত আকাল হয়নি। সে সময় পৃথিবী জুড়েছিল কত গর্ত। একজনেরই দশটা বারোটা করে গর্ত ছিল তো তখন, তাই শেয়ালরাও অন্যের গর্ত দখল করত না।

ভোঁদড় তখন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। বলল, পুরনো দিনেই যদি আমার জন্ম হত !

বুড়ো বলল, পুরনো দিনে জন্মালে আজ তুমি থাকতে কি ?

ভোঁদড় বলল, না।

বুড়ো বলল, সেটা খুব ভাল হত ?

ভোঁদড় জবাব দিতে পারলনা, মাথা চুলকাতে লাগল আর তখন বুড়ো শুরু করল তার গল্প—

আগেই বলেছি সেই সময় জঙ্গলের পশুদের সঙ্গে মিলে মিশে মানুষেরা থাকত। তা একটা মানুষ, প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারার মানুষ তার নাম ছিল বৈকান। বৈকান থাকত একটা কুঁড়ে-ঘরে। সে একা একা থাকত। নিজেই বনের ফলমূল সংগ্রহ করে আনত আর তাই খেত। সে রান্না করতে পারত না, কারণ সে যখন খুব ছোট তখন তাকে বহু দূরের এক রাজপ্রাসাদ থেকে জঙ্গলে ফেলে রেখে গিয়েছিল। সে ছিল রাজার ছেলে। রাজার ছেলের নাম সাধারণত হয় সুন্দরকুমার প্রদীপকুমার কিন্তু এর নাম হয়ে গিয়েছিল বৈকান। ছোটবেলায় কে যেন তাকে দেখে বলে উঠেছিল—এ হচ্ছে বৈকান, সেই থেকেই সে বৈকান। কিন্তু সে নিজেই তার নাম জানত না, তার কারণ এত ছোটবেলায় তাকে জঙ্গলে ফেলে গিয়েছিল যখন তার বুঝবার বয়সই হয়নি। তাই, তার নাম বৈকান হলেও সে নিজে তার নাম জানত না। কিন্তু তাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কেন ? সেটা তাহলে শোনো। যে রাজার কথা বলছি, সেই রাজার ছিল

বিরাট রাজ্য। এত বড় রাজ্য ভারতবর্ষে তখন আর ছিল না। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন মহাপরাক্রমশালী। প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল তাঁর। আর যত তাঁর ঐশ্বর্য ছিল তত ছিল তাঁর চাটুকার। রাজার চারদিকে স্বার্থলোভীর দল ঘুরঘুর করত আর তাঁকে সকলে প্রশংসা করত। এই চাটুকারদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট চরিত্রের ছিল রাজার আপন গণৎকার!

গণৎকার তো জানো, পৃথিবীতে আগে কি ঘটেছে বলতে পারে। এখন কি হচ্ছে তা বলতে পারে, আর ভবিষ্যতে কি হবে তাও বলতে পারে।

মানুষেরা তো ভারি বোকা—কেননা তারা গণৎকারের কাছে জানতে চায় আগে কি হয়েছে? আগে কি হয়েছে মানুষ তো নিজেই জানে। সে জন্য গণৎকারের সাহায্য নেওয়ার দরকার কি? কিন্তু তবু মানুষ বলে, দেখুন তো অতীতে আমার কি অসুখ হয়েছিল? গণৎকারও তো সত্যি সত্যি জানে না কার অতীতে কী হয়েছিল? সে একটা ছক এঁকে গুণবার ভান করে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ দেখছি আপনার ছেলেবেলার খুবই একটা অসুখ করেছিল। এখন, প্রত্যেকেরই ছেলেবেলায় কিছু না কিছু অসুখ করে। খুব বেশি অসুখ মানে তো সকলের কাছে এক রকম নয়। কারুর হয়ত জ্বর তার কাছে সেটা দারুণ অসুখ, আবার কারুর মাথা ধরেছে, তার কাছে সেটাই খুব বড় অসুখ। তখন গণকের কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে যায়। তবে কোনো কোনো গণক অতীতের ঘটনা চমৎকার বলতে পারে—কিন্তু তাতেই বা লোকেদের লাভ কি? লোকেদের স্মৃতিভ্রংশ হলে তবে এই রকম গণনা কাজে লাগে, সুস্থ মানুষ তার নিজের অতীত জানে, তাই গণৎকারের সাহায্য তাদের মোটেই দরকার নেই।

মানুষেরা ভারি বোকা কেননা বর্তমানে কে কিরকম আছে তাও তারা জানে, কিন্তু সেটাও তারা গণৎকারের কাছ থেকে জানতে চায়!

আবার এটাও ঠিক ভবিষ্যৎ হচ্ছে অজ্ঞাত—বিধাতাও জানেন না দু মুহূর্ত পরে কি হবে, সেটা জেনে শুনেও মানুষ ভবিষ্যৎ জানতে চায়! এটা মানুষের এক দারুণ দুর্বলতা। গণৎকারেরা মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয়। অবশ্য গণৎকারেরাও মানুষ, তাদেরও খেতে পরতে হয়, তাই মানুষদের একথা সে কথা বলে আর তার বদলে কিছু পয়সা নেয়। তারা এমন কথাও বলে যে যেন যা ঘটবে বলে ভবিষ্যতে লেখা আছে যার নড়চড় হবার উপায় নেই তাও একটা মাদুলি পরলে কিংবা পুজো দিলে সেই ভবিষ্যৎকেও পালটানো যায়!

ভোঁদড়ের এসব কথা ভাল লাগছিল না। তার মাথাতেই আসছিল না, কেননা ভোঁদড়েরা তো মানুষ নয় তাই তারা গণৎকার কি তাও জানে না আর তাই তাদের কাছে গিয়েও ধর্না দেয় না। ভোঁদড় কিন্তু বুড়োটিকে বুঝতে দেয়নি যে সে এসব কথা বুঝতে পারছে না, সেজন্য সে লুকিয়ে লুকিয়ে দু একবার হাই তুললো। বুড়ো তা বুঝতে পারল না, তাই সে বলে যেতে লাগল—

রাজাও ছিল মানুষ, আর তাঁর ছিল মানুষের মতই দুর্বলতা। রাজার একটা খুব বড় দুঃখ ছিল, আর তা হল তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। কত সাধু ফকির গণৎকার রাজাকে এসে কত যে মাদুলি আর আঙটি পরিয়ে দিল তার আর লেখাজোখা নেই। মাদুলি আর আঙটি পরার আগে রাজার ওজন ছিল দু মন। মাদুলি আর আঙটি পরার পর সেই রাজার ওজন হল আড়াই মন। আর রাজার কী ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ! এক পা চলেন তো ঝন্‌ঝন্—দু পা চলেন তো ঝনর ঝন্! তিন পা চলেন তো ঠন ঠন ঝন ঝন ঢং! চার পা চলেন তো ঢং ঢং ঝন ঝন ঘং!! আর পাঁচ পা চললে মনে হয় যেন একটা বিয়ে বাড়িতে খুব ধুমধাম করে বাজনাদাররা বাজনা বাজাচ্ছে! এইভাবে গেল বছরের পর বছর। ইতিমধ্যে রাজার সবচেয়ে বিশ্বস্ত গণৎকার রাজাকে একদিন বলল, মহারাজ কাল রাতে আমি একটা দারুণ স্বপ্ন দেখেছি!

মহারাজা বললেন, তাই নাকি। তা কী স্বপ্ন দেখেছেন আপনি?

গণৎকার বলল, মহারাজ ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

তা এসব ভনিতা করার কোনো মানেই হয় না। গণৎকার এমন একটা কথা বলতে চায় যা সে বলবেই। এ শুধু সময় নষ্ট করা, কেননা একবার কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে এটা কখনই সম্ভব নয় যে রাজা তা শুনতে চাইবেন না। আর স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন, তা সে স্বপ্নের কথা বলতে যে স্বপ্ন দেখেছে তার ভয় হবার তো কোনো কারণ নেই। রাজাও তাই বললেন, তিনি বললেন, বলুন আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন। যা দেখেছেন তা নির্ভয়ে বলুন।

গণৎকার বললেন, হুজুর—আমি স্বপ্ন দেখেছি···। বলে সে একটু থামল। যেন সে কতই ভয় পেয়েছে।

রাজা বললেন, বলুন বলুন থামলেন কেন?

গণৎকার ন্যাকামি করে বলল, আমার বলতে ভয় করছে!

রাজা বললেন, আমি তো বললাম নির্ভয়ে বলুন।

গণৎকার তখন বলল, আমি স্পষ্ট স্বপ্ন দেখেছি—হুজুর, আমার কোনো দোষ নেই—ভগবান আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন আমার ছেলে গোলাপচন্দ্র আপনার অবর্তমানে সিংহাসনে বসেছে!

রাজা ঝন ঝন করে উঠলেন। বললেন, কী বললেন?

গণৎকার আবার বলল, ভগবান আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন আমার ছেলে গোলাপচন্দ্র আপনার অবর্তমানে সিংহাসনে বসেছে!

রাজা গুম হয়ে বসে রইলেন। একটি ঘণ্টা একেবারে চুপচাপ। একঘণ্টা তিনি আচ্ছন্নের মত কাটিয়ে তার পর বললেন, এর অর্থ?

গণৎকার বলল, আমি গণনা করে দেখেছি এর একটি মাত্রই অর্থ।

রাজা বললেন, কী সে অর্থ?

গণৎকার বলল, ভয়ে বলব হুজুর, না নির্ভয়ে বলব?

রাজা বললেন, বলুন, বলুন নির্ভয়ে বলুন।

গণৎকার বলল, আমি গণনা করে দেখেছি আপনি এই বছরেই আমার পুত্র গোলাপচন্দ্রকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন।

রাজা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

তিন দিন তিন রাত ঐ ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়ে রইলেন রাজা। মূর্ছা ভাঙলে তিনি দেখলেন সার সার ডাক্তার বৈদ্য হেকিম সব তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। রাজার জ্ঞান হওয়াতে সকলেরই মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু রাজা গম্ভীর হয়েই রইলেন। তাঁর মনে তখন এক চিন্তা—নিজের ছেলের বদলে অন্যের ছেলেকে এই রাজ্য দিয়ে যেতে হবে? এত ঐশ্বর্য, এত ধন এত রত্ন, এত হাতি ঘোড়া উট?

রাজা গণৎকারকে নিভৃতে ডাকলেন। বললেন, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি?

গণৎকার বলল, মহারাজ! হুজুর, আপনি যেমন আমার সামনে রয়েছেন, আমি যেমন আপনার সামনে রয়েছি, নক্ষত্র যেমন আকাশে রয়েছে, চাঁদ যেমন আলো দেয় তেমনি সত্যি।

রাজা বললেন, তা যদি হয় তাহলে আমাকে সময় দিন। দশ দিন আমি ভেবে দেখি তারপর উত্তর দেব।

গণৎকার মুচকি হেসে বললেন, এর উত্তর তো একটাই। তবে দশ দিন সময় নিচ্ছেন সেটা আপনার খুশি।

রাজা সেই দিন রাত্রিবেলা শহরের বাইরে থেকে অন্য একজন গণককে ডেকে আনলেন গোপনে। রাজার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রী জয়নারায়ণকে পাঠালেন এই কাজে। জয়নারায়ণকে রাজা বিশ্বস্ত মনে করলেও জয়নারায়ণ কিন্তু তলে তলে প্রথম গণৎকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল। এটা ঠিক হয়েছিল যে রাজা গণৎকারের পুত্র গোলাপকুমারকে দত্তক নিলে কৌশলে তার সঙ্গে জয়নারায়ণের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। জয়নারায়ণ তাই নতুন গণৎকারকে ডেকে আনলেন তো বটেই, কিন্তু তিনি ঐ দ্বিতীয় গণৎকারকেও বলে দিলেন রাজাকে কী বলতে হবে!

দ্বিতীয় গণৎকারের সঙ্গে রাজামশাইএর অনেকক্ষণ কথা হল। দ্বিতীয় গণৎকারও রাজাকে বললেন, ভবিতব্য কেউ রোধ করতে পারে না। এটা বিধাতার সিদ্ধান্ত যে রাজাকে গোলাপকুমারকেই দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতেই হবে।

রাজা যাঁকে মনে সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রী মনে করতেন সেই জয়-নারায়ণ দ্বিতীয় গণৎকারের পকেট ভরে দিয়ে দিল স্বর্ণমুদ্রা। দ্বিতীয় গণৎকার খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেলেন!

রাজা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

তারপর আর কি? কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুভ দিন দেখে রাজা গোলাপকুমারকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। সেদিন রাজবাড়ি কত আলো দিয়ে সাজানো হল, কত বাজনা বাজল, কত গান হল। কত কাঙালীর হাসি মুখ হল। গণৎকার তো আনন্দে নিজের ঘরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচেই ফেলল!

কিন্তু রাজা-রাণীর মুখ কালো মেঘের মত অন্ধকার। গণৎকার বলল, রাজামশাই—এ হচ্ছে অতি শুভ লগ্ন, এ সময় রাজার গম্ভীর মুখ শোভা পায় না।

রাজা কি করেন জোর করে হাসেন—হা হা হা !!

রাণীকেও ঐ কথা গণৎকার বলায় রাণীও হেসে ওঠেন—হা-হা-হা !!! রাজা রাণীর হাসি দেখে প্রজারাও হাসতে থাকে। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়ে যায়।

উপায় তো নেই? বিধির বিধান তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। যা বিধি লিখে রেখেছেন তা ওলটায় কে? রাজা রাণী মেনে নিলেন সবই। আর গোলাপকুমার বড় হয়ে উঠতে লাগল, রাজার ঘোড়ার উপর উঠে তার উপর চাবুক চালাতে লাগল, হাতির উপর উঠে হাতির গায়ে সূচ ফোটাতে লাগল। দিনকে দিন বড় অত্যাচারী হয়ে উঠতে লাগল গোলাপকুমার। মানুষদের সে মানুষ বলেই মনে করে না। জানালা দিয়ে রাস্তায় চলা মানুষের মাথায় পাথর

ছুঁড়ে মারে, ভিক্ষুকের গায়ে ঢেলে দেয় গরম জল, বিয়ের শোভাযাত্রার সময় ঢিল দিয়ে মৌচাক দেয় ভেঙে, আর রেগে গিয়ে মৌমাছিরা যাকে পায় তাকেই কামড়ায়। প্রজাদের বাড়িতে সটান ঢুকে যায় গোলাপকুমার—তাদের বাড়ির জিনিসপত্র সব ভাঙচুর করে। কেউ আপত্তি করলে হা হা করে হাসে আর অত্যাচারের মাত্রা দেয় বাড়িয়ে। সমস্ত লোক রুষ্ট হয়, কিন্তু কিছু বলে না। রাজার ছেলের বিরুদ্ধে বলতে সাহস পায় না। ক্রমাগত এইভাবে চলতে চলতে তার মেজাজ হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর। তার কথায় কেউ যদি না বলে, বা ক্ষীণ আপত্তি করে তাহলেই মুশকিল। বড় বড় লাল পিঁপড়ের চাক এনে সেই চাক ভেঙে দেয় যে আপত্তি করে তার মাথায়। আর হাজার হাজার পিঁপড়ে পাগল হয়ে গিয়ে কামড়ে কামড়ে তাকে অস্থির করে। কামড়ে অস্থির হয়ে সে হাত পা ছুঁড়তে থাকে আর গোলাপকুমার খুব মজা পেয়ে নাচতে থাকে। পিঁপড়ের কামড়ে মুখ চোখ মাথা ফুলে যখন ঢোল হয় আর লোকেরা যখন শেষ পর্যন্ত মরে যায় তখন গোলাপকুমার ক্ষান্ত হয়। তখন সে নতুন লোক খোঁজে নতুন লোকের উপর নতুন অত্যাচার চালাবে বলে। এই অত্যাচার কিন্তু গণৎকার নিজেও পছন্দ করতে পারে না। মন্ত্রীও ভাবেন, এত নিষ্ঠুর কেমন করে কেউ হতে পারে? একথা কিন্তু গোলাপকুমারকে বলার জো নেই, বললেই সে তার বাবার দিকে বিরাট বিরাট কুকুর লেলিয়ে দেয়। গোলাপকুমার কুকুরই পুষেছিল তেইশটা, সেগুলির মধ্যে বাঘের মত বড় কুকুরই ছিল এগারোটা। তাদের মোটা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, আর মজা পাওয়ার জন্য সেই কুকুরদের নিয়ে বেড়াতে বেরুত গোলাপ কুমার। গোলাপকুমারকে দেখলেই রাস্তা থেকে লোক জন সব কে যে কোথায় লুকিয়ে পড়ত ঠিকঠিকানা নেই। গোলাপকুমার তা দেখে হেসে উঠত হো হো হো!

রাজার কানে যাতে ছেলের অত্যাচারেয় কথা না যায় সে জন্য

নানা রকম চেষ্টা সত্ত্বেও রাজা বুঝতে পারেন কি একটা যেন ব্যাপার ঘটেছে তাঁর রাজ্যে। লোকেদের মুখ কেমন যেন ভীত, সন্ত্রস্ত।

ব্যাপার কি ?

কেউ সরলভাবে কথা বলে না, কেউ হাসে না। কেবল মাঝে মাঝে তিনি শুনতে পান কারুর আর্তনাদ আর গোলাপকুমারের বীভৎস

অট্টহাসি হো হো হা হা !! মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কি ? মন্ত্রী বলেন, ও কিছু না। অমাত্যকে জিজ্ঞেস করেন ব্যাপার কি ? অমাত্য বলেন ও কিছু না। গণৎকারকে জিজ্ঞেস করেন ব্যাপার কি ? গণৎকার বলে ও কিছু না। রাজপ্রাসাদে যাকে পান তাকে জিজ্ঞেস করেন ব্যাপার কি ? রাজপ্রাসাদের সকলেই বলে, ও কিছু না।

রাজা চুপ করে যান।

রাজার একটা প্রিয় দেবদারু গাছ ছিল। রাজা সেই গাছের কাছে গিয়ে কাঁদেন। দেবদারু গাছ সমস্ত কথা শুনে পরামর্শ দেয় গোলাপকুমারকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিতে। কিন্তু দেবদারু গাছের ভাষা রাজা শেখেননি কখনও তাই রাজা বুঝতে পারেন না কিছু। আড়ালে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী দেবদারুর ভাষা বুঝে চিন্তিত হন। গণৎকারকে গিয়ে বলেন। গণৎকার বলে, বটে! তারপর এক কাঠুরেকে বলে দেবদারু গাছটিকে সমূলে কেটে দিতে।

কাঠুরে দেবদারু গাছ কাটতে গিয়ে বাধা পায়। দেবদারু গাছ কাতর কণ্ঠে কাঠুরেকে বলে, আমাকে কাটবেন না। আমি রাজার মঙ্গল চাই।

কাঠুরে দেবদারু গাছের ভাষা বোঝে। হাজার হাজার বছর ধরে বংশ পরম্পরা কাঠুরে গাছেদের ভাষা শুনেছে। কাঠুরে বলে, আমার উপর আদেশ আছে তাই আমাকে তা মানতেই হবে।

দেবদারু গাছ বলে, কাটবার আগে তাহলে আমার একটা ডাল কেটে সেটাকে দূরের কোনো জঙ্গলে পুঁতে দাও। তাহলে আমি সেই ডালের মধ্যেই বেঁচে থাকব। আর একটা কথা—গাছের ভাষা রাজাকে শেখাতে হবে—শেখানোর পর রাজাকে নিয়ে আসতে হবে আমার কাছে।

কাঠুরে তাতে রাজি হল। গাছ থেকে একটা ডাল কেটে সেটাকে যত্ন করে পুঁতে রেখে এল দূরের এক জঙ্গলে। সঙ্গে খেতে দিল

গোবর আর জল। দেখতে দেখতে দেবদারুর ডালটা হয়ে উঠল দেবদারু গাছ।

একথা আর কেউই জানল না।

*   *   *

এইভাবে দিন যায়। রাজ্যের প্রজার উপর অত্যাচার চলে, কিন্তু কোনো সুরাহা হয় না। কাঠুরে চেষ্টা করে রাজাকে দেবদারু গাছের ভাষা শেখাতে, কিন্তু সুযোগ আর হয় না। কাঠুরে রাজপ্রাসাদের চারদিকে ঘুরঘুর করে—কিন্তু কড়া পাহারা। ঢুকবে কেমন করে? আর ঢুকলেও রাজার কাছে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবই বা হবে কেমন করে? দুবার তো লুকিয়ে ঢুকতে গিয়ে কাঠুরেকে পাহারাদারদের হাতে দারুণ মার খেতে হল। কাঠুরে গিয়ে জঙ্গলে দেবদারু গাছকে সব বলে এল। দেবদারু গাছ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বলল, তবু চেষ্টা করুন—বহুবার চেষ্টা না করলে কেমন করে সফল হবেন? কাঠুরে বলল, আমি কেমন করে যাব বুঝতে পারি না। আপনি একটা প্রজাপতিকে দিয়ে এই কাজ করাতে পারেন না? কিংবা একটা বোলতা? বা মৌমাছি?

ঠিক কথা। দেবদারু গাছে তো কত প্রজাপতি, মৌমাছি, বোলতা এসে বসে, বিশ্রাম নেই। কাঠুরেকে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেবে না কেউ, কিন্তু একটা প্রজাপতি কি মৌমাছি কি বোলতাকে কে বাধা দেবে?

একটা হলুদ কালো রঙের বোলতাকে দেবদারু গাছ একদিন সব কথা খুলে বলল। বোলতা সব শুনে বলল—এ তো খুবই সহজ ব্যাপার। আমি রাজপ্রাসাদে ঢুকে রাজাকে গাছের ভাষা শিখিয়ে দেব। গুনগুন গাইতে গাইতে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করতে করতে বোলতা উড়ে চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, তাই তো আমি যে এই কাজ করব এর জন্য আমার পারিশ্রমিক কি মিলবে? আবার সে ফিরে এল দেবদারু গাছের কাছে। বলল,

দেবদারু মামা দেবদারু মামা আমি যে কাজ করব তার জন্য পারিশ্রমিক কি পাব? দেবদারু গাছ বলল, আমার তো দেওয়ার কিছু নেই তবে তুমি যখন খুশি আমার ডালে চাক বাঁধবে, আমি কিচ্ছু বলব না। রাজি? বোলতা খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয় রাজি!

বোলতা উড়ে চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। রাজপ্রাসাদে গিয়ে বোলতার মাথা ঘুরে গেল। কত বড় রাজপ্রাসাদ—কত মানুষ, কত জন। এত মানুষের মধ্যে কে রাজা? বোলতা কিছুই ঠাহর করতে পারল না। সে যাকে দেখে তাকেই মনে করে এই বোধ হয় রাজা! কিন্তু একটু দেখেই সে ভাবে, রাজা হবেন যদি ইনি তাহলে এঁর মুকুট কোথায়? কিংবা তরোয়াল কোথায়? কিংবা রাজার মত হাসি কোথায়? বোলতা উড়তেই লাগল, আর উড়তেই লাগল। শেষে সে দেখতে পেল একজন লোক খুব হুকুম করছে। বোলতা ভাবল রাজপ্রাসাদে যদি কেউ হুকুম করে তাহলে সেই বোধহয় রাজা! এই মনে করে সে সেই লোকটিকে ডাকল রাজামশাই।

আসলে লোকটি ছিল রাজার সেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রী। আসলে তো সে বিশ্বস্ত ছিল না। রাজা ভাবতেন ঐ মন্ত্রী খুবই বুঝি বিশ্বস্ত। বোলতা তার কানের কাছে গেয়ে বলল, রাজামশাই!
দেবদারু গাছ আমাকে খবর পাঠিয়েছে।

মন্ত্রী বলল, কে দেবদারু গাছ?

বোলতা বলল, যে দেবদারু গাছকে কেটে দেওয়া হয়েছিল। আসলে দেবদারু গাছ তো কোনো অন্যায় করেনি। আসলে অন্যায় করেছে গণৎকার আর মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলল, তাই নাকি? তাই নাকি?

কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগল—কী সর্বনাশ! যদি একথা রাজার কানে যায় তাহলে তো বিপদ!

মন্ত্রী তখন করল কি, বলল এই বোলতা তুই চিনি খাবি?

বোলতা বলল, হ্যাঁ—।

তখন একটা কালো রঙের কাঁচের শিশির মধ্যে একটু চিনি রেখে বলল, যা ওখানে গিয়ে চিনি খা যত খুশি।

বোলতা তো সরল—কোনোরকম অভিসন্ধি থাকতে পারে এমন কথা তার মনেই হল না। সে সোজা সেই কালো বোতলের মধ্যে ঢুকে যেতেই মন্ত্রী বোতলের ছিপি দিল এঁটে।

আর কি, বোলতাটা বন্দী হয়ে রইল তার মধ্যে। আর তখন বোলতার মনে হল, তাই তো আমি তো ভুল করেছি! কিন্তু তখন তা ভাবলে কি হবে। তখন সে বন্দী।

মন্ত্রী সেই বোলতাটাকে একেবারে সাত হাত গর্ত খুঁড়ে বাগানে পুঁতে ফেলল। মন্ত্রী বলল, যাক—এবার খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু মন্ত্রীর মনে হল একটা কথা ঠিক বোঝা গেল না। দেবদারু গাছ খবর পাঠিয়েছে—এ কথাটার অর্থ কি? দেবদারু গাছটিকে তো আমার চোখের সামনেই শেকড় সমেত কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। কেবল তাই নয়—পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেওয়াও হয়েছে। তাহলে দেবদারু গাছ খবর পাঠাবে কেমন করে? ভূত হয়ে?

মন্ত্রী ভাবল, তাইতো—মানুষের ভূত হয়, তাই বলে গাছেরও কি ভূত হতে পারে? মন্ত্রী ভাবল, একবার কথাটা গণৎকারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। গাছের কি ভূত হয়? ভূতের কথা ভাবতেই মন্ত্রীর সারা গা শিউরে উঠল। মন্ত্রী বলল, রাম রাম রাম!

কিছুই আর হল না। দেবদারু গাছ অপেক্ষা করতে লাগল কবে বোলতা ফিরে আসে। কিন্তু বোলতা আর ফিরে এল না। দেবদারু গাছ অন্য একটি বোলতাকে বলবে ঠিক করল।

এদিকে ঐ যে কালো বোতলে ভরা বোলতার কি হয়েছিল বলি। তাকে তো বোতল সমেত মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল। এদিকে সেটা ছিল পিঁপড়ের গর্ত। পিঁপড়েরা হঠাৎ একদিন দেখতে পেল একটা কালো বোতল। সেই বোতলের মধ্যে রয়েছে খানিকটা চিনি

আর একটা বোলতা। পিঁপড়েরা তখন সেই বোতলের ছিপি কামড়াতে লাগল! কিন্তু ছিপিটা ছিল শক্ত। তবু পিঁপড়েরা রোজই একটু একটু করে কামড়াতে লাগল—এই ভাবে বেশ কিছুদিন চলে গেলে পিঁপড়েরা দেখল বোতলের ভেতর আর চিনি নেই।

তখন পিঁপড়েরা ভাবল, দূর ছাই, এখন আর পরিশ্রম করে বোতলের ছিপি কেটে লাভ কি? এখন বোতল থেকে তো পাওয়া যাবে ঐ দুষ্টু বোলতাকে। ওকে পেয়ে লাভ কি? যাক ওটা মরে—তাতে আমাদের কি? বোলতারা বড় কামড়ায় আর তাদের হুল অতি সাংঘাতিক!

না খেয়ে তাই একদিন বোলতাটা মরেই গেল।

দেবদারু গাছ অন্য বোলতার সন্ধান করতে লাগল, কিন্তু একটা বোলতা ঐ কাজ করতে গিয়ে ফিরে আসেনি দেখে তারাও ভয় পেয়ে গেল। তারা দেবদারু গাছকে বলল, হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ঐ কাজ করব। কিন্তু তারা কেবল চলেই গেল, কিছুই করল না।

দেবদারু গাছ নিজের মনে বলল এ দুনিয়াটা কেবলি স্বার্থপরে ভরা!

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। গোলাপকুমারের গায়ে খুব জোর হয়েছে, মেজাজ হয়েছে আরও হিংস্র। এরই মধ্যে হঠাৎ দারুণ এক সংবাদ কানে এসে পৌঁছুল তার।

রাজার নাকি ছেলে হবে!

এ আবার কি আপদ! রাজার যদি ছেলে হয় তাহলে তার কি হবে? গোলাপকুমার তো জানে সে তো রাজার সত্যিকারের ছেলে নয়। সত্যিকারের ছেলে হলে ত রাজা তাকে তাড়িয়ে দেবে। কিংবা হয়ত মেরেই ফেলবে। গণৎকার একথা শুনে খুব মুষড়ে পড়ল। রাজবদ্যিকে ডেকে গণৎকার জিজ্ঞেস করল কথা যা শোনা যাচ্ছে তা ঠিক ত? রাজবদ্যি বলল, হ্যাঁ ঠিক। গণৎকার তখন রাজবদ্যিকে বলল, ভাই রাজবদ্যি আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।
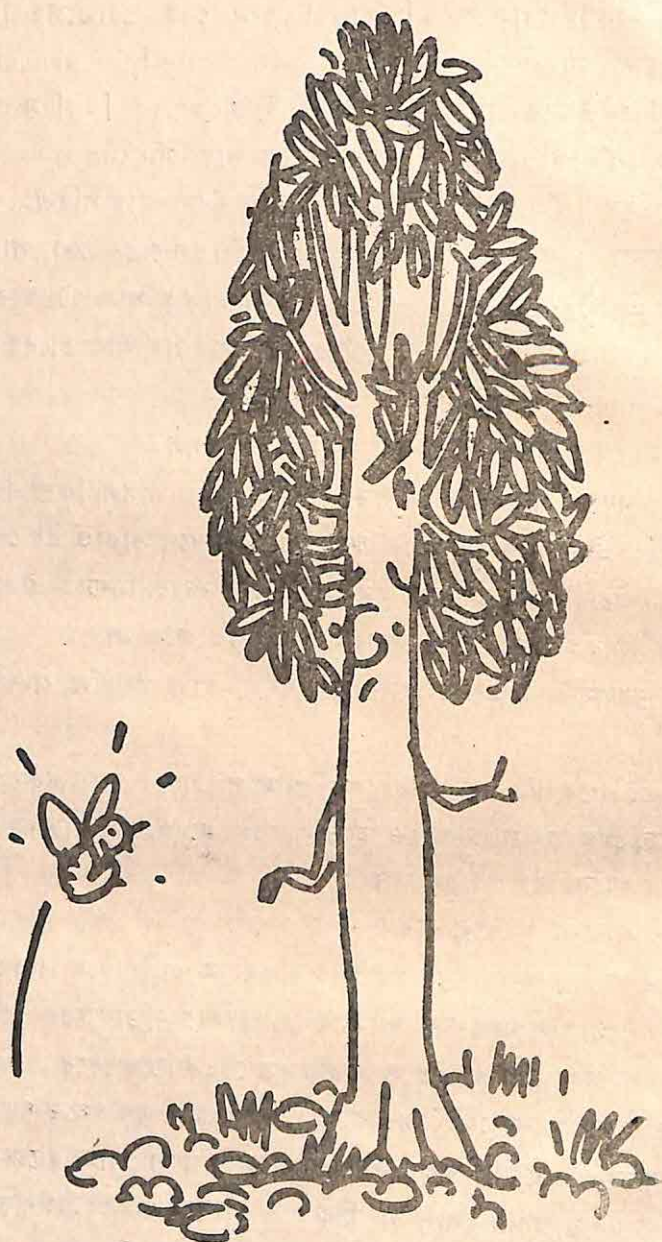
এই দুনিয়াটা কেবল স্বার্থপরে ভরা

রাজবদ্যিকে গণৎকার নিয়ে গেল নদীর ধারে।

বলল, রাণীর এই সন্তান যেন দিনের আলো দেখতে না পায়!

কী সাংঘাতিক কথা! রাজবদ্যি বললেন, কেন?

গণৎকার তখন রাজবদ্যির পকেট ভরে দিল সোনার মুদ্রায়। অত মুদ্রা রাজবৈদ্য কখনও দেখেননি! রাজবৈদ্য অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন, রাজার সন্তান কখনও দিনের আলো দেখবেন না এ ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু আরও মুদ্রা চাই। গণৎকার বলল, আরও মুদ্রা পাবেন। আমি গণনার দ্বারা জানতে পেরেছি এই যে সন্তান হবে সে হবে অতি সাংঘাতিক চরিত্রের। সে দেশকে দেশ জ্বালিয়ে দেবে। মানুষকে খুন করবে, গরুকে জলে ডুবিয়ে মারবে, কারুর ইজ্জত থাকবে না ও বেঁচে থাকলে।

রাজবৈদ্য বললেন, বুঝেছি।

গণৎকার বলল, একথা কাউকে বলা চলবে না।

রাজবৈদ্য বললেন, না—একথা কাউকে বলব না।

কিন্তু যেদিন সন্তান হবার কথা, সেদিন রাজবৈদ্যের মনে হল, ছি ছি আমি কী করতে যাচ্ছি? রাজ সন্তানকে হত্যা করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করেছি! এ অতি গর্হিত কাজ হয়েছে। সামান্য কিছু স্বর্ণ মুদ্রার লোভে আমি চিকিৎসক হয়ে এ কি করতে যাচ্ছি?

রাজপ্রসাদ থেকে উটের গাড়ি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে। রাজবৈদ্য ওষুধপত্রের বাক্স হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবেন। এমন সময় গণৎকারের সঙ্গে দেখা। গণৎকার হাসতে হাসতে বলল, মনে আছে ত? রাজবৈদ্য ম্লানভাবে বললেন, হ্যাঁ। মাথা নিচু করে রাজবৈদ্য চললেন রাজ বাড়ির দিকে। উটের খুরের আওয়াজ চতুর্দিক সচকিত করে তুলল। গাড়ি ঘোরাও। নিয়ে চলো সবুজ পাহাড়ের দিকে।

—সবুজ পাহাড়? কেন? সে যে অনেক দূর।

—সবুজ পাহাড়েই যেতে হবে। আমার একটা গাছের শেকড় কেবল ঐ পাহাড়েই পাওয়া যায়।

গাড়ি ঘুরল। দু ঘণ্টা চলবার পর সবুজ পাহাড়ের কাছে আসলে রাজবৈদ্য বললেন, থামাও।

বলে গাড়ি থামলে গাড়ি থেকে নামলেন। সহিসকে বললেন, আমি যাচ্ছি জঙ্গলের মধ্যে শেকড় আনতে। যদি তাড়াতাড়ি পাই ভাল। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরি তুমি ফিরে যাবে তাড়াতাড়ি। বলবে অন্য কোনো বৈদ্যকে ডাকতে। বুঝলে?

সহিস বলল সে বুঝেছে।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, রাজবৈদ্য ফিরলেন না দেখে সহিস দ্রুত বেগে ফিরে গেল রাজবাড়ীতে। রাজাকে সব কথা খুলে বলল। সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল অন্য বৈদ্যের কাছে।

রাজার সন্তান হল। পুত্র সন্তান। চারদিকে প্রজাদের মধ্যে আনন্দের হাট বয়ে গেল। রাজ্যে ছুটি ঘোষিত হল। ঘরে ঘরে আলোর উৎসব হল। রাজা ঘোষণা করলেন তিনদিন ধরে উৎসব হবে। সেজন্য যা খরচ হবে তা রাজকোষ থেকে দেওয়া হবে। আর দশজন পেয়াদাকে পাঠালেন সবুজ পাহাড়ে সেখান থেকে রাজবৈদ্যকে খুঁজে আনতে। রাজবৈদ্য ওষুধ খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে গেছেন।

পেয়াদারা সবুজ পাহাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল রাজবৈদ্য-র মৃতদেহ। পাশে বিষের শিশি। পকেটে একটা চিঠি। তার উপরে রাজার নাম লেখা। পেয়াদারা রাজপ্রাসাদে সে চিঠি নিয়ে ঢুকতেই গণৎকার জিজ্ঞেস করল তারা রাজবৈদ্যকে পেয়েছে কি না। তখন পেয়াদারা কি হয়েছে তা খুলে বলল। বলল, রাজবৈদ্য মারা গেছেন। মৃতদেহের পকেটে এই চিঠি পাওয়া গেছে। দুজন পেয়াদা সেখানে এখন পাহারা দিচ্ছে।

—দেখি চিঠি?

পেয়াদা চিঠিখানা গণৎকারকে দিল। গণৎকার বলল, এখন

রাজা ব্যস্ত। এ চিঠি আমি পরে তাঁকে দেখাব। তোমরা চলে যাও। বৈদ্যের মৃতদেহ জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দাও। আমি গণনা করে দেখেছি এমন মঙ্গলময় দিনে, এমন আশ্চর্য শুভ দিনে কোনো দুঃসংবাদ রাজার কানে গেলে খুব অমঙ্গল হবে।

—হুজুর রাজবৈদ্যর বাড়িতেও খবর দেব না?

—না। রাজবৈদ্যর বাড়ির লোকেরা জানতে পারলে রাজাও জেনে যাবেন, সকলেই জেনে যাবে। সমস্ত রাজ্যের উৎসব ম্লান হয়ে যাবে। নবজাত সন্তানের অমঙ্গল হবে।

পেয়াদারা চলে গেলে গণৎকার সে চিঠি খুলে পড়লেন। তাতে লেখা: মহারাজ! আমি বিষ খেয়ে চির সুন্দরের দেশে চললাম।

আমি মহাপাপী। গণৎকার আপনার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে—আপনাকে সাবধান করা আমার কর্তব্য। আমি তাই করলাম। আমি তার কাছে আপনার শিশুপুত্রকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিতান্ত অর্থলোভে। শেষ পর্যন্ত তা করতে আমি পারলাম না। আমি চললাম। আশা করি আপনারা ভালভাবে থাকবেন, এবং সুস্থভাবে আপনার সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। আমাকে ক্ষমা করুন।

ইতি রাজবৈদ্য।

গণৎকার চিঠিটাকে একটা প্রদীপের শিখার উপর রাখল। কিছু সময়ের মধ্যেই চিঠিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গণৎকার সেই ছাই মাটিতে রেখে তার উপর দাঁড়াল। মাটির সঙ্গে ছাই মিশে গেল।

গণৎকারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আজ খুব এক বিপদের হাত থেকে বেঁচেছি। কিন্তু রাজবৈদ্য কী বিশ্বাসঘাতকতাই না করতে যাচ্ছিল! লোকটি খুব সুবিধের ছিল না। তাকে বিশ্বাস করাটা ঠিক হয়নি।

সে নিজের মনেই বলল, কাউকেই বিশ্বাস করা ঠিক নয়!

রাজা গণৎকারকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—আপনার হিসেবে

ভুল ছিল। আপনি গণনা করে বলেছিলেন সন্তান হবে মৃত। কিন্তু সে বেঁচে আছে।

গণৎকার গম্ভীর ভাবে বললেন, নক্ষত্রদের যে সমাবেশে তার জন্ম হয়েছে তাতে সে হঠাৎ কিছু সময়ের জন্য বাঁচছে, কিন্তু এ সাময়িক। তা ছাড়া, আমার গণনায় ওটা স্পষ্ট—এই সন্তান জীবিত থাকলে ভবিষ্যতে সে মানুষ পশুতে পরিণত হবে।

রাজা ভীতভাবে প্রশ্ন করলেন, এর কি কোনো বিহিত করা যায় না?

গণৎকার মনে মনে হেসে বলল, তা যাবে না কেন। এর জন্য গ্রহতুষ্টি দরকার।

রাজা বললেন, গ্রহতুষ্টি দরকার? তা করার ব্যবস্থা করুন।

গণৎকার বলল, গ্রহতুষ্টি করার আগে কতকগুলো কাজ করতে হবে।

সে বড় শক্ত কাজ, সে বড় নিষ্ঠুর কাজ।

রাজা বললেন, বলুন—বলুন, যত শক্ত কাজই হক না কেন, যত নিষ্ঠুর কাজই হক না আমার পুত্রের মঙ্গলের জন্য তা করব।

গণৎকার বলল, আমি গণনায় বুঝেছি কুপিত গ্রহগণকে তুষ্ট করতে প্রচুর ধনরত্নের দরকার হবে।

রাজা বললেন, আমার ধনভাণ্ডার সে জন্য কৃপণতা করবে না।

গণৎকার বলল, এই গ্রহতুষ্টির জন্য যজ্ঞ করতে হবে।

রাজা বললেন, বেশ তো, যজ্ঞ করুন।

গণৎকার বলল, তিন বছর চলবে এই যজ্ঞ। প্রতিদিন খরচ হবে সহস্র মুদ্রা।

রাজা বললেন, তথাস্তু।

গণৎকার এবারে মোক্ষম কথাটি বলল। গণৎকার বলল, আমি জানি আপনার অর্থ দিতে কার্পণ্য হবে না। কিন্তু এবারে যা বলব তা আপনার কাছে অতি নিষ্ঠুর মনে হবে।

রাজা দৃঢ়ভাবে মনকে বেঁধে নিয়ে বললেন, বলুন।

গণক বলল, মহারাজ! আপনার ঐ পুত্রকে জঙ্গলে তিন বছর রাখতে হবে।

রাজা একথায় চমকে উঠলেন। কিন্তু তিনি চমকানর ভাব গোপন করলেন। তিনি বললেন, বেশ তো—তা একটা ব্যবস্থা করুন। জঙ্গলে একটা ছোট প্রাসাদ তৈরি করতে আজই বলে দিচ্ছি। সেখানে যে রকম দাস দাসী···।

গণৎকার বলল, মহারাজ, আপনি ভুল বুঝেছেন। আপনার পুত্রকে জঙ্গলে থাকতে হবে একা!

রাজা বললেন, কিন্তু ও যে শিশু! ও যে না খেয়ে মারা যাবে, ওকে যে বাঘে খাবে, কিংবা শেয়ালে।

গণৎকার বলল, যদি সে বেঁচে ফিরে আসে তবেই সে হবে অজেয়। সে রাজ্য থেকে দূর করবে অভাব, দারিদ্র্য, ভয়। কিন্তু আপনি যদি মত না দেন তাহলে ঐ ছেলে আপনাকে হত্যা করবে। তার লোভ এত বাড়বে যে সমস্ত লোক তার উপর বিরক্ত হবে। সোনার রাজ্য ছারে খারে যাবে।

রাজা বললেন, এই সবই কি আপনি গণনার দ্বারা জেনেছেন?

গণৎকার বলল, আজ্ঞে মহারাজ, আমি সবই গণনার দ্বারা জেনেছি।

রাজা গম্ভীর হয়ে যান। বলেন না-না-না। আপনার গণনায় ভুল আছে!

গণৎকার গর্জন করে ওঠে। বলে—কী মহারাজ, আমার গণনায় ভুল?

দুর্বল রাজা দুঃখিত মনে সায় দেন। বলেন, না-না-না।

গণৎকার খুসি হয়ে ওঠে। তার মনস্কামনা সিদ্ধ হতে চলেছে এতে খুসি তো সে হবেই।

একদিন রাণীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরের এক জঙ্গলে রাজার নিজের সন্তানকে ফেলে আসতে হয়, রাজাকেই।

এই পর্যন্ত গল্প বলার পর বুড়ো দেখল ভোঁদড়টা ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ো মনে মনে বলল, আমার গল্প কি এতই খারাপ যে ভোঁদড়টা ঘুমিয়ে পড়ল ? সে ভোঁদড়টাকে একটা খোঁচা দিতেই কিন্তু ভোঁদড়টা ধড়মড় করে উঠে দুহাতে দু চোখ কচলাতে লাগল।

বুড়ো বলল, এ কি তুই আমার গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়েছিলি ?

ভোঁদড় লজ্জা পেয়ে বলল, মোটেই না। আমি চোখ বন্ধ করে ছিলাম, ঘুমুইনি ত ?

বুড়ো বলল—তুই শুনেছিস কি শুনিসনি তা তোর কাছ থেকে বিকেলে শুনব। এখন তোকে আমি হাত পা বেঁধে একটা ঘরে রেখে দেব। এখন আমায় আবার রামধনুতে রঙ দিতে যেতে হবে কিনা সেই তেপান্তরের মাঠে ? রামধনুতে রঙ দিয়ে ফিরে এসে তোকে গল্পটা বলতে বলব। যদি দেখি তুই বলতে পারছিস না তাহলে তোকে আমি ফাঁসি দেব !

ভোঁদড় বলল, না না না !

বুড়ো, বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ! আমার গল্প হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমার গল্পের মত গল্প আর হয় না। আর তুই কিনা সেই গল্প না শুনে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিয়েছিস ! সাংঘাতিক ভোঁদড় তো তুই ? যাক তোকে আমি বেঁধে রেখে গেলাম—খবরদার পালাবার চেষ্টাও করবি না !

বুড়ো দেয়ালের ফোকর থেকে সাতটা রঙের বালতি আর সাতটা তুলি বার করল, তারপর সেগুলোকে একটা বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল। ভোঁদড় আটকা পড়ে ছটফট করতে লাগল। এমন সময় দুটো ব্যাং লাফাতে লাফাতে সেখানে এসে হাজির। ব্যাংদের দেখে ভোঁদড়ের একটু আশা হল। ভোঁদড় বলল, ব্যাঙ ভাই ব্যাঙ ভাই ! তা শুনে প্রথম ব্যাঙ বলল—কে রে আমাকে ভাই বলে ডাকে ! দ্বিতীয় ব্যাঙটাও বলল, হুঁ—কে আমাকে ডাকছে

সেটা তো দেখার নিতান্ত প্রয়োজন! ভোঁদড় বলল, এই যে আমি এখানে। আমি ভোঁদড়!

তখন প্রথম ব্যাঙ বলল—অ, তুমি ভোঁদড়? তুমি কি শূণ্যে দশ হাত লাফাতে পার?

ভোঁদড় বলল, না।

দ্বিতীয় ব্যাঙ প্রশ্ন করল—ও, তুমি ভোঁদড়? তোমার গা কি আমার গায়ের মত চকচকে?

ভোঁদড় বলল, না। আমার গায়ে লোম আছে।

প্রথম ব্যাঙ, বলল, তুমি কি ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ডাকতে পার?

ভোঁদড় বলল, না। আমি কিচমিচ করে ডাকি।

দ্বিতীয় ব্যাঙ বলল, তুমি কি ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক ঘ্যকর বলে ডাকতে পার?

ভোঁদড় বলল, না। আমি কিচমিচ করে ডাকি।

তখন দুটো ব্যাঙ একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল—তবে যে তুমি বলছিলে ব্যাঙ ভাই!

ভোঁদড় বলল, তাই তো আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম ব্যাঙ প্রশ্ন করল—তোমার কী ভুল হয়ে গিয়েছিল?

দ্বিতীয় ব্যাঙ প্রশ্ন করল—কি ভুল তোমার হয়েছিল বল!

ভোঁদড় বলল—তোমাদের ভাই বলা আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম ব্যাঙ তা শুনে খুব খানিক নাচল আর দ্বিতীয় ব্যাঙ একটা ফেলে রাখা হাঁড়ির উপর বসে নাচের তালে তালে গাইল।

ঘ্যাঁকো ঘাঁকো ঘর ঘর ঘোঁকুয়া।
কট কট কট তিরি কিরি মঁকুয়া॥

ব্যাঙদের নাচ আর গান শেষ হওয়ার পর প্রথম ব্যাঙ বলল, তোমার ভুল হয়ে গিয়েছিল কেন?

ভোঁদড় বলল, স্পষ্টই বোঝা যায় তোমরা আমার ভাই নও।

দ্বিতীয় ব্যাঙ বলল, ভোঁদড়—তোমার এই স্পষ্ট কথায় আমাদের খুব ফুর্তি হয়েছে। এইবার বল আমাদের ডাকছিলে কেন?

ভোঁদড় বলল, আমি একটা বুড়োর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন সেই অপরাধে সে আমাকে বেঁধে রেখে রামধনু রং করতে চলে গিয়েছে। ফিরে এসে সে আমাকে জিজ্ঞেস করবে গল্পটা, যদি বলতে না পারি তাহলে বোধ হয় মেরেই ফেলবে।

একথা শুনে প্রথম ব্যাঙ বলল, বুঝেছি—এ হচ্ছে রামধনু বুড়োর কীর্তি। রামধনু বুড়োর ঐ এক মুসকিল তার গল্প শুনতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যাঙ বলল, কেবল তাই নয়—শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া চলবে না।

প্রথম ব্যাঙ বলল, ঘুমিয়ে পড়লে বুড়ো পুরো গল্পটি আবার বলতে বলে। বলতে না পারলে সে মেরে ফেলে। এই ভাবে সে যে কত মানুষ জন্তু জানোয়ার মেরে শেষ করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

একথা শুনে ভোঁদড় ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। বলল, আমার কপাল বড়ই খারাপ।

প্রথম ব্যাঙ তখন ভোঁদড়ের কাছে এসে তার কপাল দেখতে লাগল নিবিষ্ট মনে। সে বলল, কপাল তো তোমার দেখছি বেশ সুন্দর। তোমার কপাল খারাপ হতে যাবে কেন? আমাদেরই বরং কপাল খারাপ। আমাদের কপাল যে কতটুকু সেটাই আমরা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না।

ভোঁদড় বলল, কপাল মানে সত্যিকারের কপাল নয়—মানে যে কপাল দেখা যায় তার কথা বলছি না। আমি বলছি ভাগ্যের কথা।

প্রথম ব্যাঙ বলল, সে আবার কেমন দেখতে?

দ্বিতীয় ব্যাঙ বলল, তার রং কি লাল?

ভোঁদড় বলল, না-না ওসব তোমরা বুঝবে না। তোমরা আমাকে এই দড়ি কেটে দেবে? তাহলেই আমি পালিয়ে যাব।

দ্বিতীয় ব্যাঙ বলল, ওসব দড়ি কাটা কি আমাদের ব্যবসা নাকি? ওসব হবে টবে না। তবে তোমার কোনো ভয় নেই। বুড়োর তো একটাই গল্প—সকলকে সেই একই কথা বলে আসছে আদ্যিকাল থেকে।

ঘ্যাঁকো ঘ্যাঁকো—ঘর ঘর

একথা শুনে প্রথম ব্যাঙ বলতে লাগল—উঃ উঃ বড্ড দুর্গন্ধ !
ভোঁদড় বলল, আমার নাকে তো দুর্গন্ধ লাগছে না !
প্রথম ব্যাঙ বলল, তা তো লাগবেই না। একই গল্প দুশো বার

শুনে শুনে সেটা একেবারে পচে গেছে। তাই ঐ গল্পের কথা মনে হলেই আমাদের নাকে দুর্গন্ধ লাগে।

ভোঁদড় বলল, তাহলে তুমি, মানে তোমরা পুরো গল্পটা জানো?

দুটো ব্যাঙ এক সঙ্গে বলল, জানব না কেন?

তখন দুজনে মিলে ভোঁদড়কে গল্পটা শোনালো। কেবল তাই নয়—বুড়ো যতখানি বলে গিয়েছিল ব্যাঙেরা তার চাইতে অনেকখানি বেশিই বলেছিল। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ভোঁদড় এজন্য ব্যাঙদের ধন্যবাদ দিল!

ব্যাঙেরা থপ থপ করে লাফাতে লাফাতে কোথায় চলে গেল।

সন্ধেবেলা রামধনু বুড়ো এসে হাজির। ক্লান্ত হয়ে এসে সে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল মাথায় একটা পাথর দিয়ে। বলল, আজ খুবই ঝামেলা গেছে। রামধনুর রঙ করা কি চাট্টিখানি কথা? নীলের কাছে দেওয়ার কথা সবুজ—তা আমি ভুল করে, করে দিয়েছি হলুদ, বাস—দেড়শো টাকার জায়গায় আমাকে ধরিয়ে দিল এগারো টাকা! তা সামান্য একটু রঙের তারতম্যে যদি এত টাকা বরবাদ চলে যায় তাহলে এমন ব্যবসা করার তো কোনো মানেই হয় না। এর চেয়ে আমার দাদার ব্যবসা ভাল।

ভোঁদড় জিজ্ঞেস করল, আপনার দাদার কিসের ব্যবসা?

রামধনু বুড়ো বলল, আমার দাদার ব্যবসা হল যারা গান গায় তাদের খবর রাজার কাছে পৌঁছে দেওয়া। কী সুবিধে তার। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ শুনতে পেল গান। বাস পকেট থেকে খাতা বার করে লিখে নাও তার নাম ঠিকানা, আর পাঠিয়ে দাও রাজার কাছে। এক একটা নাম পাঠালেই দাম পাওয়া যায় ছটা করে টাকা!

ভোঁদড় বলল, রাজা বুঝি গান-বাজনা পছন্দ করেন?

রামধনু বুড়ো বলল, মোটেই না। ঠিক তার উলটো! রাজা গায়কের নাম পেলেই পেয়াদা পাঠিয়ে দেন, তারপর তাকে মাঠে রোদ্দুরের মধ্যে সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখে সেই পেয়াদা!

ভোঁদড় বলল, আর যখন ব্যাঙেরা গান গায় ?

রামধনু বুড়ো বলল, সে আরও সাংঘাতিক ব্যাপার। ব্যাঙেদের নামও থাকে আবার ঠিকানাও থাকে, কিন্তু তারা সর্বদা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় বলে তাদের ঠিকানা থাকলেও নাম ঠিক থাকে না।

—নাম ঠিক থাকে না কেন ?

—না, মানে নাম ঠিক থাকে, কিন্তু একই ব্যাঙ একই ঠিকানায় বেশিক্ষণ থাকে না। ফলে এ ব্যাঙের বদলে অন্য ব্যাঙ শাস্তি পায়। তা তুমি ব্যাঙের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

ভোঁদড় এ কথার উত্তর দিতে যাবে এমন সময় তার মনে হল ব্যাঙেদের কথা না বলাই ভাল।

ভোঁদড় বলল, আমাকে বেঁধে রেখেছেন কেন—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

রামধনু বুড়ো বলল, বাঁধন খুলে দিলেই তো তুমি পালাবে।

ভোঁদড় বলল, আমার আবার খিদেও পেয়েছে।

রামধনু বুড়ো তখন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, তাই তো তাই তো এখন মনে হচ্ছে আমারও খিদে পেয়েছে! তা এবারে কী খাওয়া যায় ?

ভোঁদড় বলল, একটা কথা বলব ?

রামধনু বুড়ো বলল, নিশ্চয়—একটা কেন পঁয়ষট্টিটা কথা বলবে!

ভোঁদড় বলল, আমাকে যদি জ্যান্তো মাছ দুটো দিতে পারেন তাহলে বড় ভাল হয়।

রামধনু বুড়ো বলল, এ আর বেশি কথা কি ?

রামধনু বুড়ো ভোঁদড়ের জন্য বেশ কয়েকটা জ্যান্ত মাছ কোত্থেকে এনে দিল। খুব পরিতৃপ্তিতে মাছগুলোকে খেয়ে নিল ভোঁদড়। রামধনু বুড়ো কয়েকটা মাছ ভেজে পান্তা ভাত আর পেঁয়াজ দিয়ে খেল। দুজনের খাওয়া হল। এবারে রামধনু বুড়ো বলল, গল্পটা

বল দেখি এবার ? বলে চকমকি দিয়ে তামাক ধরিয়ে দিব্যি টানতে লাগল ভুড়ুক ভুড়ুক করে।

ভোঁদড় তখন গল্প বলতে শুরু করল :

সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সূর্যের রঙ এমন ঘোলাটে ছিল না আর গাছপালার রঙ ছিল সত্যিকারের কাঁচা সবুজ।

রামধনু বুড়ো খুব মৌজ করে তামাক খাচ্ছে আর বলছে, বাঃ বেশ তো তোমার স্মৃতিশক্তি ! দারুণ ব্যাপার। কিন্তু তারপর ? মনে রেখ, গল্প যদি ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে একেবারে মেরে মাটিতে পু তে দেব !

ভোঁদড় বলল, দাঁড়ান বলছি—জল ছিল পরিষ্কার, আকাশের রঙ ছিল গাঢ় নীল। বেশির ভাগ মানুষের মন ছিল খোলামেলা। অনেক মানুষ জঙ্গলের পশুদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকত।

তারপর চলল গল্পের স্রোত। এটা ঠিকই ভোঁদড়ের মনে রাখার চমৎকার শক্তি ছিল। রামধনু বুড়ো নিজের বলা গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল। তার নাক ডাকতে লাগল !

ভোঁদড় রামধনু বুড়োকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বলল, ও রামধনু বুড়ো ঘুমিয়ে পড়লেন যে ?

রামধনু বুড়ো ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, তাই তো তাই তো —এ তো মহা মুশকিল ! ভোঁদড় বলল, দেখলেন তো গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য আপনি আমাকে যা নয় তাই বলে গালাগাল দিয়েছিলেন, এমনকি গল্প ঠিকমত বলতে না পারলে মেরেই ফেলবেন বলেছিলেন !

রামধনু বুড়ো বলল, ভাই—আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এর জন্য আমাকে তুমি যে শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে নেব।

ভোঁদড় বলল, আমি চলি। আমাকে চলবার অনুমতি দেওয়া হোক।

রামধনু বুড়ো বলল, তাহলে তুমি গল্পের শেষটা শুনবে না ?

ভোঁদড় বলল, গল্পের শেষ আমার জানা আছে।

রামধনু বুড়ো বলল, গল্পের শেষ তোমার জানা আছে?

ভোঁদড় বলল, হ্যাঁ।

রামধনু বুড়ো বলল, তুমি যদি গল্পের শেষ বলতে পার তাহলে তুমি যা চাও তাই দেব।

ভোঁদড় বলল, আপনি শেয়াল তাড়িয়ে আমার গর্ত ফেরত দিতে পারবেন?

রামধনু বুড়ো বলল, নিশ্চয়! সে আর এমন বেশি কথা কি?

ভোঁদড় তখন গল্প বলতে শুরু করল। কিন্তু গল্পটার অনেকটাই তো তোমরা আগে শুনেছ। যতটুকু শোননি এখানে সেটুকু দেওয়া হল। রামধনু বুড়ো যেভাবে গল্পটা বলেছিল ভোঁদড় ঠিক সেইভাবেই গল্প বলেছিল।

বৈকান কিন্তু মরেনি। গহন জঙ্গলের মধ্যে সে কেঁদে কেঁদে উঠছিল আঁ আঁ আঁ। তেষ্টায় তার গলা কাঠ হয়ে আসছিল, আর চমৎকার নরম একটা বিছানায় শুয়ে সে হাত-পা ছুঁড়ছিল।

এইভাবেই সে থাকতে থাকতে মরেই যেত। কিন্তু সেখানে হঠাৎ আগমন হল একদল বাঁদরের। তারা প্রতি মাসে ওখানে সমবেত হয়ে আড্ডা জমাত। নানারকম মজা করত আর দিন শেষ হলে চলে যেত।

তারা হৈচৈ করছে এমন সময় আওয়াজ এল বৈকানের। আঁ আঁ আঁ! বাঁদরের সর্দার বলল, কে অমন করে ডাকে?

সকলে মিলে দেখতে গেল।

তারা দেখতে পেল চমৎকার একটি শিশু তেষ্টায় অস্থির হয়ে কাঁদছে!

সঙ্গে সঙ্গে বাঁদর সর্দার হুপাংকর হুকুম দিল, এই মুহূর্তে তাকে জল দাও!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কলার মোচার বাটিতে করে বাঁদর জল এনে দিল। চুকচুক করে বৈকান জল খেল। কিন্তু আবার সে কাঁদতে লাগল। হুপাংকর বলল, এ কাঁদে কেন আবার? এর তো জল তেষ্টা মিটেছে!

তখন একজন সঙ্গী বাঁদর বলল, ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে!

ঠিক কথা! হুপাংকর বলল, এক্ষুণি ওকে দু'ছড়া কলা এনে খাইয়ে দাও।

জঙ্গলে পাকা কলার অভাব নেই। বাঁদরের দল ভাল করেই জানে কোথায় পাকা কলা পাওয়া যায়। দশ মিনিটের মধ্যে বিরাট এক কাঁদি পাকা কলা এনে হাজির করল। কিন্তু ঐ শিশুকে কলা খাওয়ানো গেল না। তখন হুপাংকরের বৌ চিচিং বলল, ঐটুকু শিশু সে কি কলা খেতে পারে?

হুপাংকর বলল, ঠিক তো—ওর জন্য তাহলে মাংস দরকার। মানুষেরা খুব মাংস ভালবাসে!

চিচিং বলল, খুব বুদ্ধি তোমার। দেখছ না কলা-ই খেতে পারছে না ও, তাকে এখন মাংস খাওয়াতে হবে! ওকে দিতে হবে দুধ!

হুঁ! হুপাংকর বলল, দুধ। কিন্তু এই জঙ্গলে দুধ কোত্থেকে পাওয়া যাবে?

চিচিং বলল, একটা দুধওলা গরু এখানে আনতে হবে।

হুপাংকর তক্ষুণি হুকুম দিল—গরু, একটা দুধওলা গরু এক্ষুণি ধরে আনো!

চমৎকার একটা গ্রাম। বেশ কয়েক ঘর লোকের বাস। তাদের বাড়িতে গরু অনেক। দুধওলা গরুও কয়েকটা রয়েছে! গ্রামের লোক শান্তশিষ্ট। কোনোদিন তাদের যুদ্ধ করতে হয়নি। গ্রামের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক। তাদের এক

ভয় বাঘ! মাঝে মাঝেই তাদের গ্রামে বাঘ হানা দিয়ে দু'একটা গরু ধরে নিয়ে যায়! তাই তারা দিন-রাত্তির পাহারা দেয়। তাদের কাছে লাঠি ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র কিছু বিশেষ নেই। এছাড়া আছে ঢাক-ঢোল ক্যানাস্ত্রা এসব। বাঘ আসলেই তারা খুব খানিক হৈচৈ করে, চিৎকার করে আর সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে থাকে ঢাক-ঢোল ক্যানাস্ত্রা। এই গ্রামের প্রধান পাহারাদার হল টিকটিক সিং—কেউ কেউ আবার তার নাম দিয়েছে টিকটিকি সিং, কারণ তার মাথায় রয়েছে বড়সড় একটা টিকি। অনেক সময়ে সেই টিকির সঙ্গে দেখা যায় দু'একটা বিড়ি বাঁধা রয়েছে! টিকটিক সিং-এর বেশ লম্বা চেহারা, ঠিক যেন একটা বাঁশ, তার উপর একটা হাঁড়ি উলটো করে রাখা। এদিকে তো টিকি অত বড় এদিকে আবার গলাবন্ধ কোট আর সেই কোটের উপর দুটো তকমা আঁটা। এই টিকটিক সিং-এর সঙ্গী হল ফিকফিক সিং। ফিকফিক সিং-এর হাতে থাকে বিরাট একটা গাদা বন্দুক। কিন্তু কোনো বারুদ নেই, আর বন্দুকটাতে মরচে ধরা। মাঝে মাঝেই ফিকফিক সিং বসে বসে বন্দুকে তেল-টেল দিয়ে পরিষ্কার করে রাখে আর ফিকফিক করে হাসে। ফিকফিক সিংএর চেহারা একটু বেঁটে আর বেজায় মোটা। অনেক দূর থেকে টিকটিক সিং আর ফিকফিক সিংকে দেখলে মনে হয় যেন একটা বড় লাঠি আর একটা ফুটবল আসছে।

একদিন টিকটিক সিং আর ফিকফিক সিং বসে বসে ধুলোর উপর দাগ দিয়ে কাটাকুটি খেলছে এমন সময় তারা শুনতে পেল মাঠের দিক থেকে দারুণ হাম্বা হাম্বা আওয়াজ আসছে। তৎক্ষণাৎ টিকটিক সিং তার টিকি থেকে একটা বিড়ি নিয়ে চকমকি দিয়ে একটুখানি শোলা ধরিয়ে তা থেকে বিড়ি ধরিয়ে বলল, একবার তাহলে ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!

ফিকফিক সিং বলল, হুঁ—ঠিক কথা একবার দেখতেই হয় তাহলে।

টিকটিক সিং বলল, যাও তুমি দেখে এসো বাঘ এসেছে কিনা।

ফিকফিক সিং একটা বড় লাঠি নিয়ে ছুটে চলল মাঠের দিকে। তারপর শান্তভাবে ফিরে এল।
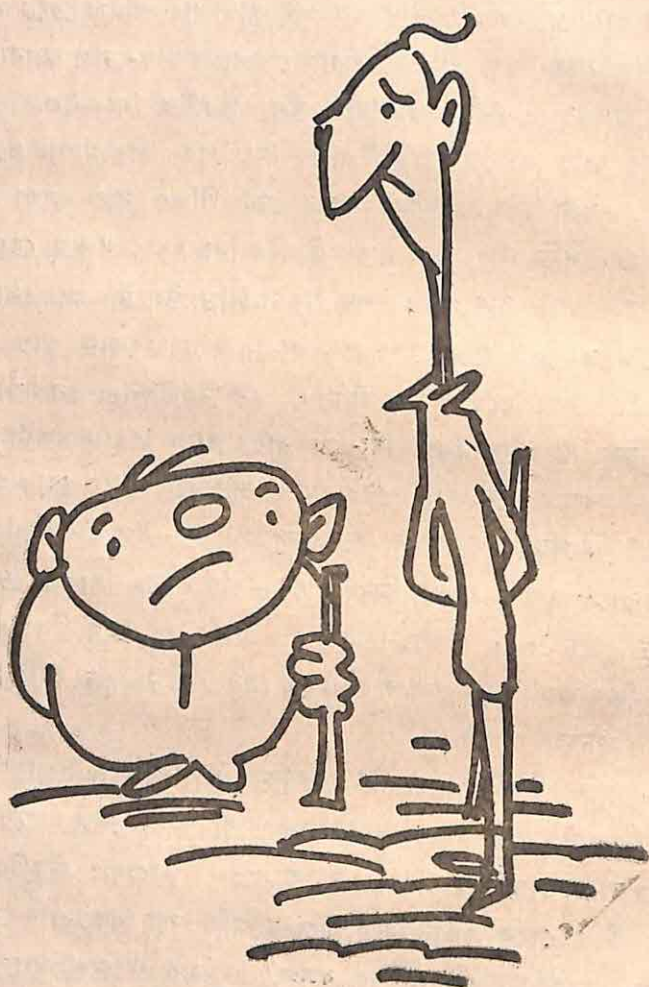
টিকটিক সিং-এর সঙ্গিটি

টিকটিক সিং বলল, কী খবর? বাঘ এসেছে?

ফিকফিক সিং বলল, না—বাঘ নয়।

—তাহলে বসে পড়। খেলা চলুক।

ধুলোয় দাগ কেটে আবার তারা শুরু করল কাটাকুটি খেলা। প্রায় আধ ঘণ্টা এরকম চলার পর টিকটিক সিং বলল, একটা কথা বললেন না ত। গরুরা অমন অযথা হাম্বা হাম্বা করছিল কেন?

ফিকফিক সিং বলল, ও কিছু না। কয়েক ডজন বাঁদর এসে দুটো গরু নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। সে এক দেখবার মত জিনিস।

টিকটিক সিং বলল, দেখবার মত জিনিস—তা আমাকে বললে না কেন?

ফিকফিক সিং বলল, আমি আপনাকে ঠিক বলতাম—কিন্তু রাস্তায় একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে রয়েছে দেখে ভাবতে লাগলাম ওটা ওখানে পড়ে রয়েছে কেন? আর ওটা ভাবতে ভাবতেই বাঁদরদের গরু চুরি করে নেওয়ার কথা ভুলে গেলাম।

টিকটিক সিং গর্জন করে বলল—উঃ খুব অন্যায় হয়ে গেছে—দু দুটো গরু চুরি গেল আমাদের। এখন গ্রামের লোকেদের কাছে কৈফিয়ৎ দেব কি?

ফিকফিক সিং বলল, কেন আমাদের পাড়ার কৈফিয়ৎ মশাইএর কাছে গেলেই তিনি কৈফিয়ৎ দেবেন। আজকাল কৈফিয়তের দামও অনেক কম—চার আনায় পাঁচটা।

তখন টিকটিক সিং আর ফিকফিক সিং দুজনে মিলে চলল কৈফিয়ৎ মশাইএর কাছে।

কৈফিয়ৎ মশাই বিকেল বেলাতেই সেদিন নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। তাঁর দরজার বাইরে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা:

কৈফিয়ৎ! কৈফিয়ৎ!! কৈফিয়ৎ!!!

সমস্ত রকম কৈফিয়ৎ আমরা অতি যত্নের সহিত
সরবরাহ করিয়া থাকি। দর অতি কম—নমুনা
কৈফিয়ৎ এক ডজন মাত্র আট আনা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

টিকটিক সিং গর্জন করে ডাকল—ও কৈফিয়ৎ মশাই, ও কৈফিয়ৎ মশাই !

চিৎকার চ্যাচাঁমেচি শুনে কৈফিয়ৎ মশাই নাকের ডাক থামিয়ে হাঁক দিলেন, কে রে ?

টিকটিক সিং বলল, এই যে আমরা !

ফিকফিক সিং বলল, আপনার গ্রামেরই পাহারাদার। আমাদের কৈফিয়ৎ দরকার !

কৈফিয়ৎ মশাইকে ত তখন বিছানা থেকে উঠতেই হল।

বিছানা থেকে উঠে তিনি একটা বিরাট মোটা বই নিয়ে এলেন।

—কৈফিয়ৎ দরকার ? কিসের কৈফিয়ৎ ?

তখন টিকটিক সিং আর ফিকফিক সিং দুজনে মিলে সব খুলে বলল।

কৈফিয়ৎ মশাই সব শুনে বললেন, এ যে খুব গোলেমেলে ব্যাপার এরকম কৈফিয়ৎ তো শস্তা দরে দেওয়া চলবে না, এর জন্য তো পুরনো কোনো কৈফিয়ৎই খাটবে না। নতুন কৈফিয়ৎ বানাতে হবে।

টিকটিক সিং বলল, আজ্ঞে এর জন্য কত দরকার হবে ?

কৈফিয়ৎ মশাই একটা কাগজের উপর অনেকক্ষণ হিসেব করে বললেন খুব কম করে হলেও একটাকা তেরো আনা দরকার। তখন তো টিকটিক সিং আর ফিকফিক সিংএর মুখ চুন হয়ে গেল। তারা বলল, আজ্ঞে আমরা তো নগদে কিছু দিতে পারব না, তবে চারটে তরমুজ দিতে পারব।

একথা শুনে কৈফিয়ৎ মশাই বললেন, পাঁচটা।

বেশ বেশ তাই হবে। বলল টিকটিক সিং।

তখন একটা কোণে গিয়ে কৈফিয়ৎ মশাই বললেন, এবারে বলুন কিসের কৈফিয়ৎ চান।

ফিকফিক সিং বলল, একটু আগেই তো বললাম।

কৈফিয়ৎ মশাই বললেন, আপনারা বলছেন একদল বাঁদর এসে

গ্রামের মানুষের দুটো গরু চুরি করে নিয়ে গেছে এই তো ? ঐ সময় আপনাদের পাহারা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আপনারা ধুলোর উপর দাগ কেটে কাটাকুটি খেলছিলেন। খুব ভাল কথা—তা কাটাকুটি খেলায় কে জিতল ?

ফিকফিক সিং বলল, তার কি আর হিসেব আছে—একবার আমি জিতি একবার উনি জেতেন এইভাবেই চলে। কোনো হিসেব রাখা হয় না।

কৈফিয়ৎ মশাই বললেন, ভারি অন্যায় ভারি অন্যায়। হিসেব একটা রাখা উচিত ছিল। যাকগে যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আসল কথায় আসা যাক।

হুঁ। টিকটিক সিং টিকি নেড়ে বলল, এবারে আসল কথা বলুন আমরা কী কৈফিয়ৎ দিই ?

কৈফিয়ৎ মশাই বললেন, সেটা তো আসল কথা নয়—।

ফিকফিক সিং বলল, তাহলে আসল কথা কি ?

কৈফিয়ৎ মশাই বলল, আসল কথা হল তরমুজ। আগে তরমুজ চাই তবে তো কৈফিয়ৎ !

তখন টিকটিক সিং আর ফিকফিক সিং বেরলো তরমুজের সন্ধানে। কিন্তু তরমুজ কোথায় পাওয়া যায় ? বাজারে এক একটা তরমুজের দাম বারো আনা। সেজন্য তারা চলল কোথায় তরমুজের ক্ষেত আছে দেখতে। কেবল তাই নয়, তরমুজের ক্ষেত থাকবে আবার সে ক্ষেতে পাহারাও দেবে না কেউ এটাও হতে হবে তো !

তাই টিকটিক সিং আর ফিকফিক সিং পোঁটলা বেঁধে চলল তরমুজের সন্ধানে।

তারা শেষ পর্যন্ত তরমুজ পেয়েছিল কিনা, কিংবা পেলেও তার বদলে কৈফিয়ৎ মশাই কী কৈফিয়ৎ তাদের দিয়েছিলেন তা আমার জানা নেই। আর সেটা জানার বোধ হয় দরকারও নেই।

এদিকে বাঁদরেরা ছুটে গরু চুরি করে নিয়ে গেল সেই গহন বনের মধ্যে যেখানে বৈকান খিদেয় অস্থির হচ্ছিল।

গরু দুটোকে নিয়ে বাঁদরেরা প্রথমেই মোচার খোলায় করে দুধ দুয়ে ফেলল। বাঁদরেরা বাঁদর হলে হবে কি, এব্যাপারে তারা একটুও বাঁদরামি করল না। ঠিকমত দুধ দুয়ে সেই দুধ তৎক্ষণাৎ বৈকানকে খাইয়ে দিল।

এইভাবে দিন যায়। বৈকান বড় হতে থাকে। সে বাঁদরের ভাষা বুঝতে শেখে, ছোট গাছ বড় গাছ লতাপাতা ফুল ফলের ভাষা শিখে নেয়। মৌমাছি, বোলতা, ভ্রমরের ভাষা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। বৈকান একটু বড় হতেই তাকে নিয়ে একটু গোলমাল শুরু হয়। বাঁদরেরা বলে যেহেতু তারা বৈকানকে বাঁচিয়েছে, মানুষ করেছে, সেজন্য তাকে বাঁদরধর্মে দীক্ষিত করা হবে। সে তো বাঁদরের ভাষা জানেই, এখন তাকে ভাল করে বাঁদরামি শেখানো হবে।

এই নিয়ে খুবই হৈচৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। একদল হাতি ছিল সেই বনে। তাদের কাজ ছিল বৈকানকে শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে চান করিয়ে দেওয়া, বৈকানকে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো। হাতিদের সর্দার বলল, না—যদি করতে হয় তাহলে বৈকানকে হাতিধর্মে দীক্ষিত করা হবে। তখন বাঘেরা গর্জন করে বলল, হাতিধর্ম না হাতি! বৈকানকে আমরা বাঘ বানিয়ে ছাড়ব। ঐ জঙ্গলে ছিল বড় বড় হিমালয় ভাল্লুক, তারা দিব্যি শীতের ঘুম দিচ্ছিল—এই গোলমালে তাদের ঘুম একটু ভাঙতেই তারা বলল, বাঘ কেন হবে, বৈকান হবে ভালুক! এদিকে কলাগাছের দল বলল, এই বৈকান এত কলা খেয়েছে যে ওকে কলাগাছ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। ওকে কলাগাছ বলে ঘোষণা করা হোক। পাখিদের মধ্যে ছিল ঘুঘু, ময়না আর প্যাঁচা। ঘুঘু বলল, বৈকান যে একটা ঘুঘু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওকে ঘুঘুই বানানো হক। প্যাঁচা বলল, না বৈকান হচ্ছে প্যাঁচা। কী সুন্দর ওর প্যাঁচার মত চোখ!

এদিকে দেবদারু গাছ, আম জাম কাঁঠাল গাছ প্রত্যেকেই চায় বৈকান তার মত হোক।

এই নিয়ে জঙ্গলে সে কি অশান্তি! জঙ্গলে দারুণ রকম যুদ্ধ বাধে আর কি! বাঘেরা গর্জন করতে থাকে, পাখিরা চ্যাঁ চ্যাঁ করতে

থাকে, গাছেরা মিড়মিড় করতে থাকে, হাতি আর ভালুকেরা হৈচৈ করতে থাকে। কেবল একটি কথা বলে না জিরাফেরা।

তার কারণ জিরাফেরা কথা বলতে পারে না। আওয়াজ করার ক্ষমতাই তাদের নেই।

এখবর গেল জঙ্গলের রাজা সিংহ-র কাছে!

জঙ্গলের রাজা সিংহ। কিন্তু তার ভয়ও কম নয়। হাতিদের দেখলে সিংহের বুক একটু কেঁপে ওঠে। আর উঠবেই বা না কেন?

এই তো বছর কয়েক আগেকার কথা। সিংহ মশাই বছরে একবার তাঁর প্রতিপত্তি ফলাতে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরেন। সেবারই হল ব্যাপারটা। সিংহ জঙ্গলে বেড়াচ্ছে—এমন সময় দেখা হল একটা খরগোশের সঙ্গে।

খরগোশ! সিংহ গর্জন করে বলল—বলো ত এই জঙ্গলের রাজা কে?

খরগোশ ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়—আপনি হুজুর!

তাহলে আমার লেজ টিপে দে!

খরগোশ সিংহের লেজ টিপে দিল। সিংহ তখন খরগোশকে আশীর্বাদ করে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে লাগল। এবারে দেখা হল ভালুকের সঙ্গে। বিরাট ভালুক। কিন্তু সিংহকে দেখে সে যেন এক-রত্তি হয়ে গেল।

ভালুক! সিংহ গর্জন করে বলল—বলো ত এই জঙ্গলের রাজা কে?

ভালুক ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়—আপনি হুজুর!

তাহলে আমার লেজ টিপে দে!

ভালুক সিংহের লেজ টিপে দিল। সিংহ তখন ভালুককে আশীর্বাদ করে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে লাগল। এবারে দেখা হল শেয়ালের সঙ্গে।

শেয়াল! সিংহ গর্জন করে বলল—বলো ত এই জঙ্গলের রাজা কে?

শেয়াল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেয়—আপনি হুজুর!

তাহলে আমার লেজ টিপে দে !

শেয়াল সিংহের লেজ টিপে দিল। সিংহ তখন শেয়ালকে আশীর্বাদ করে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে লাগল। এবারে দেখা হল কুমিরের সঙ্গে। কুমির একটা খালের ধারে রোদ্দুর পোয়াচ্ছিল।

কুমির! সিংহ গর্জন করে বলল—বলো ত এই জঙ্গলের রাজা কে ?

কুমির একথা শুনে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ল, আর বেশ খানিকটা জল ছিটকে এসে সিংহের নাকে মুখে লাগল। সিংহ মনে মনে বলল, আচ্ছা অসভ্য তো কুমির! উত্তরই দিল না। ওকে খুব শাস্তি দেওয়া দরকার। দশ বারো বার সে নিজের মনেই বলল, শাস্তি দেওয়া দরকার—শাস্তি দেওয়া দরকার! কিন্তু শাস্তি দিতে হলে তো জলে গিয়ে কুমিরকে টেনে ডাঙায় আনতে হয়।

তাই সিংহ বলল, এবারে তোকে মাফ করে দিলাম।

বলে সিংহ জঙ্গলে ঘুরতে লাগল।

এবারে দেখা হল হাতির সঙ্গে। বিরাট এক হাতি দুটো কলা-গাছ ভেঙে থোড় খাচ্ছিল। কলাগাছের থোড় হাতিদের খুব প্রিয়।

সিংহ হাতির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হাতি! সিংহ গর্জন করে বলল—বলো ত এই জঙ্গলের রাজা কে ?

হাতি কোনো উত্তর না দিয়ে থোড় খেতে লাগল।

হাতি! তুই কি কালা নাকি ? বল্ না এই জঙ্গলের রাজা কে ?

হাতি কোনো উত্তর না দিয়ে থোড় খেতে লাগল।

সিংহ তখন হাতির কানের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলল, হাতি! বলো ত এই জঙ্গলের রাজা কে ?

হাতি তখন সিংহকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধপাস করে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলল।

সিংহের খুব লেগেছে। বেশ রেগেও গেছে সে। সিংহ হাতির কাছে গিয়ে বলল, হাতি! এই জঙ্গলের রাজা কে এর উত্তর তুই

জানিস না, তা বলে অমন রাগ করার দরকার কি ছিল, ভাল করে বললেই আমি বুঝে নিতাম।

তা এই সিংহের ডাক পড়ল এর একটা বিহিত করতে। বৈকান জঙ্গলেই থাকবে কিন্তু সে কার কাছে থাকবে কি হবে এইটে সিংহকে বলে দিতে হবে।

যেদিন সভা সেদিন সকলের কী উৎসাহ। গভীর জঙ্গলে একটা বড় পুকুর ছিল, সেই পুকুরের কাছেই একটা ছোট পরিষ্কার জায়গা, সেখানেই সভা হবে। ওরকম চমৎকার জায়গা সে তল্লাটে আর নেই। জায়গাটার অনেক সুবিধে। কাছেই সুন্দর সুন্দর ফলের বাগান। যার যেরকম খুশি ফল সেখানে থইথই করছে। আম, জাম, কাঁঠাল তো ছিলই, আর ছিল গাব, বেতফল, কামরাঙা, ডঁ্যাফল। একটা জায়গায় তো দিব্যি আঙুরলতা হয়েই ছিল আর তাতে থোকা থোকা আঙুর। পাশেই বিরাট একটা জায়গা জুড়ে মর্তমান কলার ঝাড়। আর পুকুরের জল ছিল মিষ্টি। জলে ছিল প্রচুর মাছ। আর জলে মাছ যেমন ছিল তেমন ছিল বড় বড় কুমির আর হরিয়াল। পুকুরের ধারে গাছে গাছে কত পাখি। আর কেবল কি ফলের গাছ—নানা দেশের ফুলও সেখানে চমৎকার ভাবে ফুটে থাকত জঙ্গল আলো করে।

বিকেল চারটের সময় সভা। সকাল থেকেই সেখানে জন্তু জানোয়ার, পাখি, জলের কুমির, হরিয়াল—এমনকি কাঁকড়া, কচ্ছপ ওরাও এসে গেছে—যদিও মীটিংএ তাদের থাকবার কথাও নেই দরকারও নেই। তারা এসেছে মজা দেখতে। মীটিংএ সকলেই উৎসাহ করে এসেছে, কেবল রাগ করতে করতে এসেছে প্যাঁচা। প্যাঁচাদের কাছে যখন সভার কথা ঘোষণা করা হয় তখন প্যাঁচারা বলেছিল, সময় বদলাতে হবে। দুপুর চারটেয় বেরুতে কেমন গা ছমছম করে! চোখ তখন ঘুমে বুঝে আসে। কিন্তু প্যাঁচাদের কথায় অন্য কেউ আমল দেয়নি, অবশ্য বাঘ, শেয়াল, ভালুক এদের রাত্রে

সভা করতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু দিনের বেলাতেও তাদের আপত্তি করার কথা মনে হয়নি।

যাই হোক, প্যাঁচাদের আপত্তি সত্ত্বেও সভা বসেছে। সভার এক কোণে বৈকান বসে আছে। বৈকান এখন বড় হয়েছে। বাঁদরেরা মানুষের বাজার থেকে বৈকানের জন্য কত পোশাক এনে দেয়, বৈকান সেগুলো পরে। মানুষের দোকান থেকে কত রকম খাবার এনে দেয় বৈকান খায়। বৈকান খায় আর অবাক হয়। কিন্তু মানুষদের রাজ্য কোথায় কত দূরে তা সে জানে না। দু একবার তার ইচ্ছে হয়েছে বাঁদরদের সঙ্গে মানুষদের রাজ্যে গিয়ে সব দেখে শুনে আসা, কিন্তু বাঁদরেরা তাতে রাজি হয়নি। তারা বলেছে, মানুষেরা আমাদের দেখলে এমনিতেই ক্ষেপে যায়, সঙ্গে মানুষ নিয়ে গেলে তারা আর আস্ত রাখবে না।

বৌকন মানুষের ভাষা শিখতে চায়। এতে অবশ্য বাঁদরেরা আপত্তি করে না। ময়না, টিয়া এরা সব গিয়ে মানুষদের ভাষা শিখে এসে বৈকানকে শেখায়। বৈকান মানুষের ভাষা শেখে। এইভাবে বৈকান যে কত রকম ভাষা শিখল তার আর ইয়ত্তা নেই। কেবল প্রাণীর ভাষা নয়, পাখির ভাষা নয়, সূর্যের চাঁদের ভাষা, গাছের ভাষা, বিষ্টির ভাষা, পাহাড়ের ভাষা পর্যন্ত শিখে ফেলল।

যাক্ এবারে সভার কথা বলি। সভায় বক বলল, আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এই মানুষের ছানাটিকে কি করা হবে তাই নিয়ে। আপনারা জানেন, মানুষের ছানাকে মানুষ করতে হয়, এমনিতে মানুষ হয় না। মানুষেরাই মানুষের ছানাকে মানুষ করে। তেমনি বকের ছানাদেরও মানুষ করতে হয়। বকেরা বকের ছানাকে মানুষ করে, শেয়ালে শেয়াল ছানাকে মানুষ করে, নেকড়ে নেকড়ের ছানাকে মানুষ করে। এইভাবেই মানুষ করা প্রথাটি বহু যুগ থেকে চলে আসছে। এখন এই যে মানুষের ছানাটি এখানে রয়েছে—এ মানুষ হয়েছে কিনা আগে জানতে হবে।

—হ্যাঁ হয়েছে, হ্যাঁ হয়েছে !! সমস্ত সভায় রব উঠল।

—বেশ! বক বলল, এ যখন মানুষ হয়েই গেছে তখন জানতে হবে কে তাকে মানুষ করেছে। এখানে দেখছি বাঁদর ভাইরা বলছেন তাঁরাই এই মানুষের ছানাটিকে মানুষ করেছেন। অতএব এখন একে বাঁদর হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়েছে। দাবি করেছেন বাঁদর ভাইরাই। এর বিরুদ্ধে কারুর কিছু বলবার আছে?

একথায় অনেকেই হৈচৈ চিঁমিঁ চ্যাচ্যাঁ করে জানালো প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলার আছে। কেবল জিরাফ ছাড়া। জিরাফের দল এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু আধটু পাতা-টাতা খেতে লাগল।

বক বলল, এরকম চিৎকার করলে সভার কাজকর্ম করা সম্ভব নয়। একে একে সকলেই তাঁদের কথা বলুন। আচ্ছা, আমি ডাকছি —ভালুক ভাই, আপনি কিছু বলবেন?

ভালুক উঠে বলল, হ্যাঁ—আমি বলতে চাই। পৃথিবীর ইতিহাসে ভালুকে মানুষের ছানাকে মানুষ করেছে এমন উদাহরণের অভাব নেই। আমার কাছে এই বাবদ প্রচুর দলিল রয়েছে। বলে ভালুক তার পাশে রাখা থলি থেকে চারকেজি পুরনো খবরের কাগজ আর দশ বারোটা পুরনো চিঠি বার করল। তারপর সেগুলোকে পরম যত্নে থলের মধ্যে ভরে বলল, অতএব আমি বলতে চাই, এই মানুষের ছানাকে অতঃপর ভালুক সমাজেই গ্রহণ করা হোক।

বক বলল, বাস—আর নয়। এবারে বাঘ ভাই বলুন।

বাঘ একটা বিরাট হাই তুলল, তা দেখে দু চারটে হরিণ হুড়মুড় করে এদিক ওদিক সরে গেল। পরে যখন দেখল ওটা একটা হাই— অন্য কিছু নয়, তখন তারা ফের আবার নিজেদের নিজেদের জায়গায় বসল।

বাঘ বলল, ভালুক যা বলল তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। কোনকালে কে কোন মানুষের ছানাকে মানুষ করেছিল তার উপরে

বর্তমান বিষয়টি নির্ভর করে না। আমার মতে এই যে মানুষের ছানা-টিকে বড় করা হয়েছে এর পর স্বাভাবিকভাবেই এর বাঘ সমাজেই স্থান হওয়া উচিত—কেননা, আমরা দেখেছি এর বাঘের মত সাহস!

বক বলল, বাঘ ভাই—আপনার কথা আমরা শুনলাম এবারে, শেয়াল ভায়া কিছু বলুন।

শেয়াল বলল, এই যে মানুষের ছানা বলে সকলে একে বলছেন, কিন্তু এ আদপেই মানুষের ছানা নয়—এ হচ্ছে শেয়ালছানা। আপনারা তার প্রমাণ চাইবেন নিশ্চয়। চাইবারই কথা। এবার ভেবে দেখুন তো যখন এই শেয়ালছানাটিকে জঙ্গলে পাওয়া গেল তখন ছানাটি কি বলছিল? আপনাদের মনে করিয়ে দিই, এই ছানাটি ডাকছিল ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া বলে! বলুন কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে না মিথ্যাত্ব আছে? এখন আমি বলছি ক্যা হুয়াই বলেছিল শেয়াল-ছানাটি। আর যদি কোনো ছানা প্রথম থেকেই ক্যা হুয়া বলে তাহলে তাকে শেয়ালছানা-ই বলা উচিত কিনা? তাকে আপনারা মানুষের ছানা বলছেন, কিন্তু কোন্ অর্থে সে মানুষ? আমি বলছি সে শেয়াল। আর শেয়ালকে শেয়াল সমাজেই থাকতে হবে। এটাই নিয়ম।

বক বলল, এবারে নেকড়ে বাঘ কিছু বলুন। একথায় নেকড়ে বাঘ বলল, মানুষের ছানাটিকে নেকড়ে সমাজেই রাখতে হবে। তার কারণ বহু মানবশিশুকে নেকড়ে মানুষ করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শেয়াল মশাই যে বললেন এটি মোটেই মানুষের ছানা নয়, এটি শেয়ালছানা তা ঠিক নয়। এ যে মানবশিশু তার প্রমাণ এ দু-পায়ে দাঁড়ায়।

এইভাবে একের পর এক বক্তা সব বলার পর ফয়সালা কিছু হল না। তখন বক প্যাঁচাকে বলল, একটা কিছু সিদ্ধান্ত করতে। প্যাঁচা তখন বলল, এ ব্যাপারে নানা রকম গোলমাল দেখা দেওয়ায় আমি ময়নাকে এ বিষয়ে পুরো তদন্ত করবার ভার দিচ্ছি। ময়না

তদন্তের জন্য একমাস সময় দেওয়া হল। ইতিমধ্যে এই মানুষের ছানাটি প্রত্যেকের বাড়িতে একদিন করে থাকবে।

সভা ভেঙে গেল। সিংহ উদাস হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। জল থেকে একটা কুমির মাথা বাড়িয়ে সব দেখল, কিন্তু ডাঙায় এল না। হাতি এ সভায় কিছু বলল না, কিন্তু সে বারবার সিংহের দিকে তাকিয়ে বিশ্রীরকম হেসেছে, কিন্তু সিংহ সে নিয়ে কিছু গাঁইগুঁই করেনি। সিংহ জানে সিংহই জঙ্গলের রাজা—আর হাতির স্মরণশক্তি খুব প্রখর হওয়া সত্ত্বেও সে যদি তা ভুলে যায় তাহলে আর কি করা। সেইজন্য সে চুপ করেই রইল। কিন্তু মনের মধ্যে সে সিংহের গর্জন শুনতে পেল। সিংহ ভাবল, এই যে আমি সিংহের গর্জন শুনতে পাচ্ছি মনে মনে, এটাই তো আসল, এটাই তো আমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

বৈকানকে নিয়ে ময়না তদন্ত শুরু করার আগেই একটা দারুণ ঘটনা ঘটে গেল, যা ঐ জঙ্গলের ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি।

দলে দলে মানুষ এসে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে লাগল, আর পশু পাখিদের হল মুশকিল।

বক ময়নাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, এত মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে আসছে কেন? এনিয়েও একটু তদন্ত করো।

ময়না খবর আনল। সাংঘাতিক সে খবর।

সেই যে বিরাট রাজ্য, যে রাজ্য থেকে বৈকানকে এনে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে, সেই রাজ্যের রাজাকে বন্দী করা হয়েছে।

বন্দী করেছে কে?

না, বন্দী করেছে তাঁরই পুত্র গোলাপকুমার!

জঙ্গলে আরও খবর এল গোলাপকুমার রাজার আসল পুত্র নয়, দত্তক পুত্র।

আরও জানা গেল রাজার নিজের পুত্রকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন রাজা নিজে, গণৎকারেরই নির্দেশে।

তখন বক হিসেব করে বলল, তাহলে ঐ মানুষের ছানাটাই নিশ্চয় আসল রাজপুত্র !

—হ্যাঁ তা তো বটেই। কে যেন বলে উঠল গম্ভীর গলায়।

—কে, কে বলল ? তারা চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে।

—কে, কে একথা বলল ? ময়না কিচকিচ করে জিজ্ঞেস করল। গম্ভীর গলায় উত্তর হল। আমি।

এবারে সকলের মনে হল দেবদারু গাছের ভেতর থেকে কেউ বলছে কথাটা। বোধহয় ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখি-টাখি কেউ হবে। মনে মনে ভাবল বক। তারা কত খুঁজেছে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখি, কিন্তু সন্ধান পায়নি। বক খুশি হয়ে উঠল। ভাবল এবারে বুঝি তারা ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখির দেখা পাবে। ময়নাকে সে কথা বলতে ময়না বলল, না না ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গলার আওয়াজ তো এরকম নয়। তাদের গলার আওয়াজ কেমন সুরেলা।

তাহলে তো ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর কথা শুনতে হচ্ছে ! একটা খরগোশ ঝোপের ভেতর থেকে বলে উঠল।

আসলে খরগোশটার মোটেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর প্রতি আগ্রহ ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি খরগোশ সেই প্রথম ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর নাম শুনলো। খরগোশটা ছিল ভারি দুষ্টু—তাই সে মিছিমিছি ঐ কথা বলেছিল। এদিকে ময়না তো তা জানে না। ময়না ভেবেছে সত্যিই বুঝি খরগোশের ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখিদের কথা জানতে ইচ্ছে হয়েছে। তখন ময়না বলল, সে অনেক দিন আগেকার কথা। এক দেশে ছিলেন এক রাজা—তাঁর ছিল সুখের সংসার। রাজার তিন পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম শ্যামলবন্ধু দ্বিতীয় পুত্রের নাম বিমলবন্ধু আর তৃতীয় পুত্রের নাম কমলবন্ধু। তিন জনেরই চেহারা চমৎকার। তিন জনেরই গায়ে দারুণ জোর। চোর ডাকাত বদমায়েশ তাদের ভয়ে কম্পমান। কিন্তু হলে কি হবে, শ্যামলবন্ধুর সব ভাল ছিল, কেবল

মিষ্টান্ন দেখলে তার কোনো খেয়াল থাকত না, সে মিষ্টির জন্য ছটফট করত। বিমলবন্ধুর দুর্বলতা ছিল শিকারে। কোথাও বাঘ এসেছে কি গণ্ডার অমনি তার তখনি সেখানে ছুটে যাওয়া চাই। যতক্ষণ না সে নিজের হাতে শিকার করছে ততক্ষণ তার মনে শান্তি নেই। আর কমলবন্ধুর ছিল সব কিছু হারিয়ে ফেলার অভ্যেস। তাকে হয়ত কেউ একটা তরোয়াল রাখতে দিয়েছে সে হয়ত লুকিয়ে রাখল পুকুরের মধ্যে, কিংবা চিলেকোঠার ছাতে। এমনিতে এসব করা খারাপ যে তা নয়, যদি তার সে কথা মনে থাকত, কিন্তু সে হরদম সব ভুলে যেত। আবার হয়ত কখনো কখনো দশদিন, দু'বছর, কি আরও পরে তার মনে পড়ত। এজন্য কেউ তার উপর কোনো দায়িত্বের কাজ দিতে চাইত না।

এখন সেই রাজ্যে হঠাৎ একটা রাক্ষস এসে হাজির হল। সে যে রাক্ষস তা প্রথম দিকে মোটেই বোঝা যায়নি। দিব্যি রোগা পটকা একটা বুড়ো মানুষ যেন চলতে গেলে কষ্ট হয়, বলতে গেলে শক্তিতে কুলোয় না, দেখতে গেলে যেন ঝাপসা দেখে। কোন মতে এক ধনী লোকের বাড়ির দরজার কাছে শুয়ে থাকে আর ভিক্ষে করে। দয়ালু লোকেরা কেউ দেয় পয়সা কেউ দেয় খাবার। সে পয়সা নিয়ে ঝুলিতে পোরে আর খাবার নিয়ে লুকিয়ে রাখে অন্য একটা ঝুলিতে। ও সব খাদ্য—যেমন চাল ডাল, বা তৈরি ভাত এসব তার মুখে রোচে না। সারাদিন এরকম চলার পর সন্ধ্যে হতেই চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে, আর তখন অনেকের বাড়ির আলোই ক্ষীণ হয়। চারিদিকে আবছা আবছা ভাব। সেই সময় ঐ বুড়ো তার নিজমূর্তি ধরে। সে অন্ধকারে মন্ত্র উচ্চারণ করে, আর তার আল-খাল্লার পকেট থেকে একটা বোতল থেকে লাল রঙের শরবত খায়। সঙ্গে সঙ্গে সে বদলে যায়। তার বুড়োর দেহ রূপান্তরিত হয় যুবকের দেহে। আর বড় বড় মুলোর মত তার দাঁত হয়। আর সে তখন বেরয় তার প্রিয় খাদ্য মানুষের ছানার সন্ধানে। শহরতলিতে গ্রামে

গঞ্জে মায়েরা শিশুকোলে ঘুমোয় আর এই রাক্ষস সেখানে অতর্কিতে হানা দেয়। ছিনিয়ে নিয়ে আসে শিশুপুত্র। কেঁদে ওঠে মায়েরা, বাবারা উন্মাদ হয়ে ধরতে যায় ঐ রাক্ষসকে। কিন্তু রাক্ষসের সঙ্গে তারা পারবে কেন। রাক্ষস ছুটে চলে যায় জঙ্গলে। সেখানে আছে তার বৌ ছেলেমেয়ে। তারা মজা করে মানুষের ছানা খায়। আর রাত পোয়াবার আগেই রাক্ষস ফিরে এসে তার পকেট থেকে একটা শিশি থেকে সবুজ ওষুধ খায় আর সঙ্গে সঙ্গে সে আগের মত বুড়ো হয়ে পড়ে। আর বসে বসে ঝিমোয়, যেন কিছুই জানে না। প্রজাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। প্রজারা এসে রাজদরবারে কাঁদতে থাকে। বলে, রাজা—আমাদের রক্ষা কর। রাজা বলেন দেখি। রাজা বলেন মন্ত্রীকে, এর একটা বিহিত করো। মন্ত্রী বলেন, দেখি। মন্ত্রী বলেন কোটালকে। কোটাল বলেন, দেখি। কোটাল বলেন পাহারাওলাদের—পাহারাওয়ালারা বলে দেখি। পাহারাওলা শেষ পর্যন্ত কিছুই করে না। সন্ধ্যে হলে সেও বাড়িতে চলে যায় আর খেয়েদেয়ে ঘুম মারে। এইভাবেই রাজত্ব চলে। রাক্ষসের অত্যাচার চলতেই থাকে। রাজার নামে নিন্দে রটে। প্রজারা ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। কেউ কেউ যায়ও, সকলেই পারে না। শ্যামলবন্ধু, বিমলবন্ধু আর কমলবন্ধুর এই ব্যাপারে খুব মন খারাপ। তারা একদিন বসে বসে স্থির করল—কেউ যদি না করে তাহলে তাদেরই এই উৎপাত বন্ধ করতে হবে।

ঠিক হল প্রথমে শ্যামলবন্ধু চেষ্টা করবে, সে ব্যর্থ হলে তারপর চেষ্টা করবে বিমলবন্ধু, তারপর যদি সে ব্যর্থ হয় তখন কমলবন্ধু চেষ্টা করবে। কিন্তু করতে হবে সম্পূর্ণ গোপনে, কেননা রাজা জানতে পারলে এই বিপদের মধ্যে তাদের যেতে দেবেন না।

একদিন বিকেলবেলা শ্যামলবন্ধু হাতে একটা তরোয়াল নিয়ে পাহারা দিতে বেরুল। ঘুরতে লাগল পথে পথে সন্ধ্যে থেকে রাত্তির। রাত্তির থেকে ভোর। ভোর থেকে সকাল। কিন্তু কিছুই হয় না।

প্রতি রাত্রে ঠিক একটি করে মানুষের ছানা উধাও হয়ে যায়। তার আর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। এইভাবে চলতে চলতে জঙ্গলের
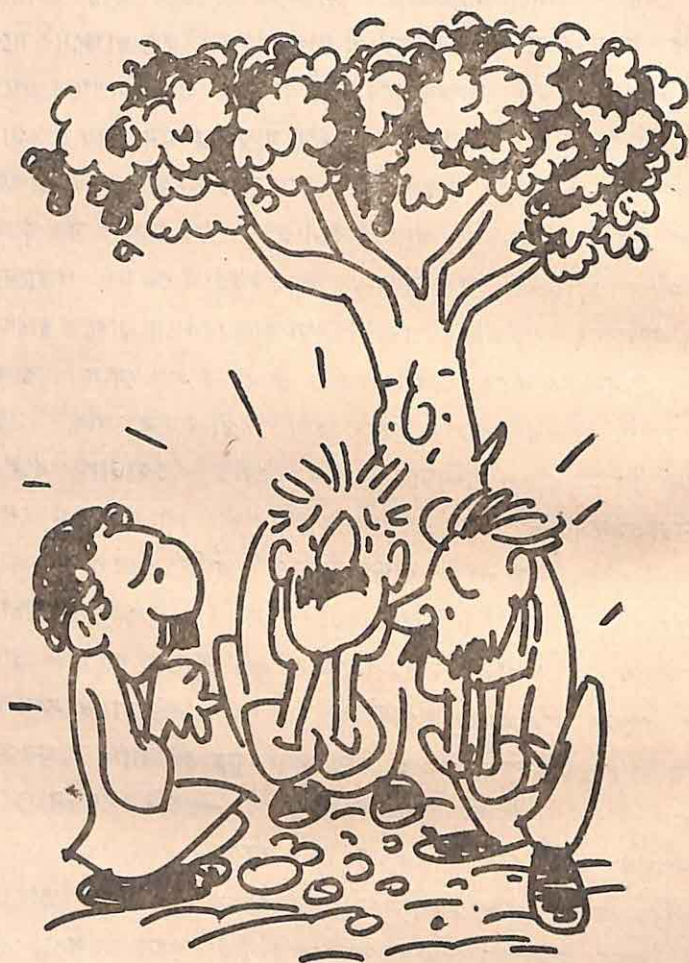
শ্যামলবন্ধু বিমলবন্ধু কমলবন্ধু

মধ্যে ছোটদের হাজার হাজার পোশাকের একটা ডাঁই হয়ে গেল, আর একদিন ঘূর্ণিঝড়ে সেই সব পোশাক উড়তে উড়তে এসে পড়ল একেবারে রাজধানীর উপরে। এই পোশাক কোত্থেকে এল।

শ্যামলবন্ধু লোকেদের জিজ্ঞেস করে—কোন্ দিক থেকে পোশাক-গুলো এল। কেননা এটা তো শুধু এ সমস্ত পোশাকেই সেই হারিয়ে যাওয়া ছোটদের পোশাক। লোকেরা তখন বলল তারা দেখেছে পোশাকগুলো উড়ে এসেছে পশ্চিম কোণ থেকে। শ্যামলবন্ধু তখন চলেন রাজধানী থেকে পশ্চিমের দিকে।

যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যায়।

সন্ধ্যের অন্ধকারে রাক্ষস পরিবার বলে, হাঁউ মাঁউ কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ !! আর মুহূর্তের মধ্যে শ্যামলবন্ধুর মৃত্যু ঘটে ঐ রাক্ষস পরিবারের হাতে।

রাক্ষসের যে বৌ রাক্ষসী, সে খেয়ে বলে চমৎকার। রাক্ষসের যে দাদা বড় রাক্ষস, সে বলে চমৎকার। রাক্ষসের বৌদি বলে, বেশ। কিন্তু রাক্ষসের ছানারা বলে, বিচ্ছিরি ! মাংস তেমন কচি নয়। তারা শ্যামলবন্ধুর হাড়গোড় সব একটা জায়গায় পুঁতে রাখে।

শ্যামলবন্ধু ফিরে না আসায় বিমলবন্ধু যায় রাক্ষসের সন্ধানে। এবারে আর তাকে কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হয় না রাক্ষসের আস্তানা, কেননা শ্যামলবন্ধু যাওয়ার আগে তাকে জানিয়ে যায় সে যাচ্ছে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে। বিমলবন্ধু তরোয়াল নিয়ে সেই জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

সেখানে গিয়ে তারও দশা ঘটে শ্যামলবন্ধুরই মত।

তাকে খেয়ে দেয়ে তার হাড়গোড় পুঁতে রাখে রাক্ষসের দল।

বিমলবন্ধু আর ফেরে না। রাজবাড়িতে হাহাকার পড়ে যায়।

এবারে যাবে কমলবন্ধু। কমলবন্ধুও একদিন বেরিয়ে পড়ে রাক্ষসের সন্ধানে।

সেও জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। আর জঙ্গলে ঢুকেই সে ভুলে যায় কেন সে জঙ্গলে এসেছে। এদিক ওদিক ঘোরে। জঙ্গলের ফল খায়, ঝরনার জল খায়। আর কি সব ভাবে। সে ভুলে যায় সে রাজপুত্র।

এইভাবে দিন কাটে। কমলবন্ধুর ভাগ্য ভাল তাকে রাক্ষসেরা দেখতে পায়নি। একদিন কমলবন্ধু একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে এমন সময় সে শুনতে পেল গাছের উপর থেকে কথা ভেসে আসছে।

প্রথম বলছে—আহা বেচারা কমলবন্ধু। সে সব কথা ভুলে গেছে।

দ্বিতীয় জন বলছে—ওর ঐরকমই স্বভাব। ক্রমাগত সব ভুলে যায়।

প্রথম জন বলছে—এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

দ্বিতীয় জন বলছে—তা থাকবে না কেন। সে যদি আরবী ঘোড়ার জন্য রাখা ভেজানো ছোলা খায় তাহলেই তার এই ভুলে যাওয়া স্বভাব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে তাকে তার দুই দাদাকে বাঁচাতে হবে।

—কেমন করে?

—সে যদি শহরের কালো রঙের ভিখিরীটার আলখাল্লা থেকে লাল রঙের শিশি আর নীল রঙের শিশির তরল পদার্থ দশ ফোঁটা দশ ফোঁটা নিয়ে এক সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারে আর বাকিটা জঙ্গলের মধ্যে ঝরনার ধারের নিম গাছটার তলায় খুঁড়ে হাড়গোড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে পারে তাহলেই তার দাদারা বেঁচে উঠবে।

—আর তার স্মরণশক্তি কেমন করে ফিরবে?

—সে যখন দাদাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরবে সেই সময় সে যদি ঐ খালি শিশিটা নিজের মাথায় দুবার ঠেকায় তাহলেই তা হবে।

কমলবন্ধু তাকিয়ে দেখল দুটি অদ্ভুত রঙের বিরাট পাখি গাছের উপর বসে আছে। তার একটির ল্যাজে লেখা রয়েছে ব্যাঙ্গমা, আর অন্য পাখিটার ল্যাজে লেখা রয়েছে ব্যাঙ্গমী।

কমলবন্ধু অবাক হয়ে গেল পাখির ল্যাজে নাম লেখা দেখে। সে আর কোনো পাখির গায়ে বা ল্যাজে তাদের নাম বা অন্য কিছুই

লেখা দেখেনি। আর এমন চমৎকার গলার আওয়াজও কোনো পাখির হতে পারে বলে সে ভাবেনি।

সে তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীদের দেখছে—এমন সময় ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীরা দেখতে পেল কমলবন্ধু তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী গাছের দুটি ডাল হয়ে হাওয়ায় নড়তে লাগল! কী আশ্চর্য ব্যাপার! ভাবল কমলবন্ধু।

তারপর তার মনে হল, এক্ষুনি তার দাদাদের তো বাঁচাতে হয়। এখন শহরে গিয়ে বের করতে হবে আলখাল্লা পরা কালো রঙের ভিখিরীকে। তারপর তার আলখাল্লা থেকে বের করতে হবে দুটো শিশি। একটা শিশির মধ্যে থাকবে লাল, অন্য শিশির মধ্যে থাকবে সবুজ। তারপর...।

কিন্তু তারপর যে কী করতে হবে কমলবন্ধু তা আবার ভুলে গেল।

আর ভুলে গেল বলেই সে সেই আলখাল্লা পরা কালো রঙের ভিখিরীকে খুঁজে বার করল ঠিকই, কিন্তু সে তার সামনে গিয়ে ভেবেই পেল না এবারে কি সে করবে।

আলখাল্লা পরা ভিখিরী তাকে দেখে বলল, কী হে—তুমি এখানে এসেছ কেন, চাও কি?

কমলবন্ধু থতমত খেয়ে বলল, কি জানি আমি কি চাই!

ভিখিরী হা হা হা হা করে হেসে উঠল।

কমলবন্ধু সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

তা এই হল সেই গল্প যে গল্পের মধ্যে ছিল ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী। ময়না বলল। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গলা ছিল সুরেলা। চমৎকার। কিন্তু ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী সেই যে গাছের সঙ্গে মিশে গাছ হয়ে গেল, তারপর আর তাদের ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে যাকগে।

ময়না থামল।

তাহলে কি ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী আর নেই? এই পৃথিবীর যে দুটি ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী ছিল সে দুটিই এখন গাছের ডালে রূপান্তরিত? ময়নাকে এই প্রশ্ন করাতে ময়না বলল, না, তা হবে কেন? এখনও কিছু ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখি রয়েছে পৃথিবীতে। তবে তারা এখন আর পাখির বেশে থাকে না, কেউ থাকে গাছ হয়ে, কেউ থাকে পাথর হয়ে, কেউ থাকে আকাশের মেঘ হয়ে, কখনো বিষ্টি হয়েও থাকে। তবে, কখনও কখনও তারা নিজমূর্তি ধরে। তারা অনেক সময় ফিরে যেতে চায় সেই পুরনো পৃথিবীতে। সেই পুরনো পৃথিবীতে যেখানে মানুষ ছিল না।

—বড় সুখের ছিল তো সেই পৃথিবী!

—সে আর বলতে! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল ময়না।

গল্প বলেই চলেছে ভোঁদড়। রামধনু বুড়ো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ছে। মাঝে মাঝে আবার তামাকটা বেশ করে সেজে নিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক টানছে! কিন্তু কিছুতেই ঘুমুবে না এই প্রতিজ্ঞা করেছে তো, তাই জেগে জেগেও উঠছে। এই ভাবেই রামধনু বুড়ো শুনে চলেছে। ভোঁদড় বলে চলেছে, কিন্তু গল্প আর শেষই হতে চায় না যেন। ভোঁদড়েরও মাঝে মাঝে আলস্য আসছে। মাঝে মাঝে সে হাইও তুলছে—আবার একটু একটু করে ঘুমিয়েও নিচ্ছে।

ভোঁদড় রামধনু বুড়োর কাছ থেকে শোনা গল্প বলে চলেছে:

রাজা তো বন্দী হয়েছেন। বন্দী করেছে তাঁরই পুত্র গোলাপ-কুমার। কবচ মাদুলি তাগা আর নানা ধাতু আর পাথরের আঙটিতে প্রায় ঢাকা রাজার পায়ে পরানো হয়েছে শেকল। রাজা স্তব্ধ। বুঝতে পারেন তাঁর বিরুদ্ধে দারুণ ষড়যন্ত্র হয়েছে। তাঁর ছিল বিপত্তারিণী আঙটি, কবচ আর তাগা। রাজা ভাবলেন—দূর ছাই, এসব রেখেও তো বিপদ ঠেকানো গেল না, তাহলে এসব রেখে কী হবে?

তিনি হীরের আঙটি ছুড়ে ফেলে দেন জানালার বাইরে। তিনি ফেলে দেন তাঁর দৈব কবচ আর মাদুলি। তিন দিন ধরে তিনি তাঁর সমস্ত দামি অদামি কবচ আঙটি আর তাগা ফেলে দেন।

ফেলে বেশ হালকা বোধ করেন।

এইভাবে রাজা সময় কাটান। মাঝে মাঝে তিনি কাঁদেন—কিন্তু সে শুকনো কান্না। চোখ দিয়ে জল বেরয় না।

আর রানী?

রাজা যেখানে বন্দী, রানী সেখানে কি ছাড়া থাকবেন? রানীও বন্দিনী, রাজপ্রাসাদেরই অন্য এক কোণে।

দিন যায়।

তাঁরা মাঝে মাঝে শোনেন প্রজাদের কান্না। আর শোনেন গোলাপকুমারের অট্টহাসি।

কে একজন ভৃত্য এসে রাজাকে খবর দেয়, রাজাকে এবং রানীকে করা হবে হত্যা।

কিন্তু রাজা এবং রানী ভাবেন, সেই ভাল। এমন জীবন যাপনের চেয়ে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া ভাল।

কিন্তু তখন জঙ্গলে অন্য এক ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল।

গাছ—বনের পুরনো দেবদারু গাছ কথা বলছিল।

আর সেই গাছের কথা শুনছিল বনের যত গাছপালা পশুপাখি আর আকাশ।

খরগোশ বলল, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ গাছই কথা বলছে। শেয়াল বলল, কিংবা গাছের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পাখি। সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী।

বাঘ বলল, না এ কথার মধ্যে কোনো গন্ধ নেই। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এর দুটো কিংবা চারটে পা কিছুই নেই। অর্থাৎ কিনা এ নিশ্চয় গাছের আওয়াজ। গাছের কথা।

গাছ বলল, ঠিক—ঠিক কথা! আমি গাছ, কথা বলছি। আমার

কথা শোনো। আমি তোমাদের তুমি বলছি। তার কারণ আছে। আমার বয়স তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি!

এই নিয়ে কিছু গোলমাল হল। একটা কাঁঠাল গাছ বলল, এর বয়স তেমন বেশি নয়। আমিই একে দেখেছি এতটুকুন! মানুষের হাতের দু হাত লম্বাও হবে না, কিংবা টিয়াপাখির বা ময়নার হাতের পনের হাতও হবে না।

তখন দেবদারু গাছ বলল, হ্যাঁ—কিন্তু আমার আসল শরীরটা তো এখানে নেই। আমার সে শরীরটার অনেক বয়স।

একটা কচ্ছপ জিজ্ঞেস করল, দুশো হবে?

দেবদারু গাছ বলল, দুশো? পাঁচশো-র কম নয় বুঝেছ ছোকরা?

তখন কচ্ছপ চুপ মেরে গেল।

যাই হোক। বনের গাছপালা পশুপাখি সকলে শুনল বৈকানের কথা। দেবদারু গাছ বলল, এখন শহরের মানুষ বনে চলে এসেছে—কিছুদিনের মধ্যেই তারা প্রচুর গাছ কেটে বসতবাড়ি বানাবে, আর গাছের ফলমূল কিছু আস্ত রাখবে না। বনের হরিণ, খরগোশ খেয়ে শেষ করবে আর বাঘ ভালুক হাতিদের মেরে শেষ করে দেবে। এখন যদি আত্মরক্ষা করতে হয় তাহলে তার একমাত্র উপায় হল গোলাপ-কুমারের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে তার জায়গায় পুরনো রাজাকে প্রতিষ্ঠা করা।

একথায় সকলেই সায় দিল। সায় দিল না কেবল কুমির আর কচ্ছপ।

দেবদারু গাছ বলল, আপনারা এ ব্যাপারে পিছিয়ে রইলেন কেন, সায় কেন দিলেন না?

তখন কুমির বলল, কেন সায় দেব? মানুষ তো জঙ্গল দখল করেছে, নদীতে তো নামেনি। নদী তো আমাদের রয়ে গেছে। কচ্ছপও সেই একই কথা বলল।

কিন্তু তাদের এই মনোভাব বেশিক্ষণ রইল না।

হঠাৎ কে এসে খবর দিল নদীর ধারে কুমিরদের ডিম ছিল মানুষেরা সেই সব ডিম নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।
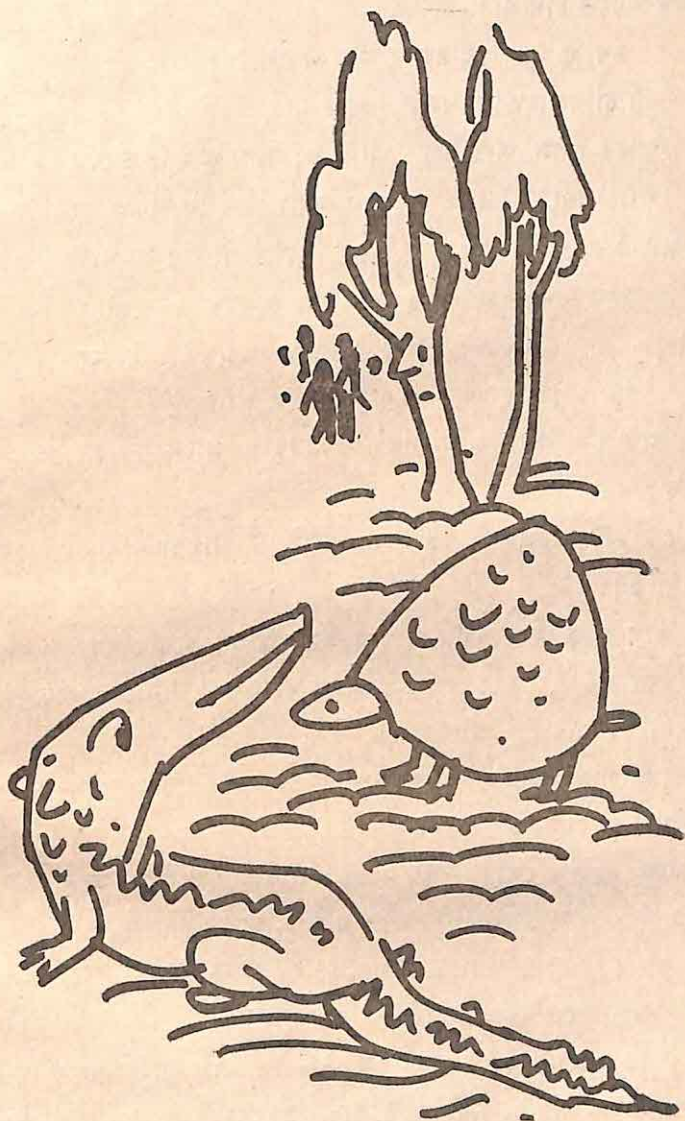
কুমির তখন বলল, আমিও দলে আছি—আমরাও দলে আছি।

প্যাচা চোখ মিটমিট করে বলল, নিজের আঁতে ঘা না লাগলে কেউ কিছু করতে চায় না।

একথা শুনে কুমির বলল, কী, কী বললে?

প্যাঁচা গম্ভীরভাবে বলল, কিছুই না।

কুমির বলল, তাই বল। আমি ভাবলাম তুমি কিছু যেন বলছিলে!

প্যাঁচা নিজের মনেই কি যেন বলল আর ফিকফিক করে হাসল। কিন্তু কুমির তা হয় দেখল না, নয়ত দেখেও গা করল না।

এদিকে দেবদারু গাছে হয়েছিল প্রকাণ্ড এক মৌচাক। সেই মৌচাক থেকে একদল মৌমাছি ঐ খানে জমায়েত হয়েছিল।

একটা মৌমাছি বলল, আমরাও দলে আছি।

বাঘ সে কথা শুনে বলল, আমরাও মানে কি? কে কথা বলছ?

মৌমাছি বলল, এই যে আমি। আমরা—আমরা হলাম মৌমাছি!

বাঘ হা হা করে খানিক বেরালের মত মুখ করে হাসল। বলল, তা মৌমাছি তোমার চাকে তো মধু থাকে। আমাদের দলে এলে ঐ মৌচাক পাহারা দেবে কে?

মৌমাছি বলল, আপনারা সকলে এক সঙ্গে থাকলে আর মৌচাক পাহারা দেওয়া দরকারই হবে না!

তবে দলে থাকো! বাঘ বলল। কিন্তু বাঘ মনে মনে ভাবল মৌমাছিকে দলে নিলে কিই বা আর লাভ হবে?

এবার একদল পিঁপড়ে এল। তারা বলল, আমরা সবই শুনেছি —আমরাও দলে থাকতে চাই।

দেবদারু গাছ একথায় খুব অসন্তুষ্ট হল। লাল লাল সব পিঁপড়ের দল তার গা বেয়ে রাতদিন যাতায়াত করে আর তার খুব সুড়সুড়ি লাগে। বহুবার সে পিঁপড়েদের তার গা থেকে চলে যেতে বলেছে, কিন্তু পিঁপড়েরা কথা শোনেনি। দেবদারু বলল, না—না।

পিঁপড়েরা বলল, হে দেবদারু গাছ—আপনি একটি মহান গাছ। আপনার আশ্রয়ে আমরা থাকি। আপনারা একটা বড় কাজ করছেন, আমাদেরও সেই কাজের মধ্যে থাকতে দিন।

এবারে প্যাঁচা বলল, যে কাজ এখন করার কথা হচ্ছে তার জন্য যেতে হবে অনেক দূর। যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু কোনো গাছ হাঁটতে পারে না, যুদ্ধ করতে পারে না। তাই গাছদের এই দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর পিঁপড়েরা বলছে কিনা দেবদারু গাছ একটা বড় কাজ করছে। বড় কাজ করার মত ক্ষমতা আছে দেবদারু গাছের? কিংবা কোনো গাছের?

একথায় দেবদারু গাছ বলল, আমাদের ক্ষমতা নেই? আমাদের কাঠ দিয়ে কি যুদ্ধের রথ বানানো হয় না? গাছ না থাকলে মৌমাছি ফুলও পায় না আর তার মধুও হয় না। গাছ না থাকলে ফল হয় না, ফল না হলে বাঘ মরে যেত।

একথায় বাঘ হুঙ্কার দিয়ে বলল, কক্ষনো না। আমরা ফলটল আদবেই খাই না। আমরা গাছপালার কিচ্ছু খাই না।

বটগাছ বলল, কিন্তু গাছপালার ছায়ায়, আড়ালে তো লুকিয়ে থাকো। তা ছাড়া যে হরিণ তোমরা খাও, যে সম্বর, নীলগাই যে খরগোশ না হলে তোমাদের আয়েস হয় না তারা কি খেয়ে বাঁচে? এই যে এতবড় পৃথিবী রয়েছে, এর মধ্যে গাছ ছাড়া কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারত কি? গাছকে কখনোই তুচ্ছ করা উচিত নয়। এমনকি ঘাসও জীবদের বাঁচিয়ে রাখে। ঘাস না থাকলে বিষ্টির জলে সব মাটি কাদা হয়ে ধুয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ত!

তখন অবশ্য ঠিক হল গাছদেরও দলে নিতে হবে। সকলেই দলে থাকলে বেশ মনে জোর পাওয়া যায়।

কিন্তু তবু একজন দল থেকে বাদ রয়ে গেল। সে হল ইঁদুর। ইঁদুর মনে মনে বলল, এরা সবাই যখন যুদ্ধ করতে যাবে তখন খুব মজা করে সব খাওয়া-দাওয়া করা যাবে আর নষ্ট করা যাবে। তা

ছাড়া, ইঁদুরেরা শুনেছিল রাজবাড়িতে খুব জঘন্য ধরনের বেশ কিছু বেরাল আছে। সেই বেরালরা নাকি একেবারেই অহিংস নয়!

ইঁদুরেরাই কেবল এই বিরাট একটা ব্যাপারে চুপচাপ রইল।

রামধনু বুড়ো কলকের জ্বলন্ত কাঠকয়লা একটু উসকে নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দিল অম্বুরি তামাক। আবার চমৎকার গন্ধে চারদিক ম ম করে লাগল। তারপর দু চোখ বন্ধ করে বেশ করে টেনে বলল, তারপর?

খরগোশ বলল, তারপর তো আপনি জানেন। আমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন?

রামধনু বুড়ো বলল, হ্যাঁ, আমি এর পুরোটাই জানি—তুমি যা বলছ তা তো আমারই বলা। কিন্তু তবু আমার তা শুনতে ভাল লাগছে। তুমি বলে যাও।

খরগোশ দেখল ভারি বিপদ—কিন্তু না বললেও নয়। তখন সে বলতে লাগল আবার।

বৈনাককে করা হয়েছে অভিযানের নেতা। গোলাপকুমারকে গদিচ্যুত করে রাজাকে মুক্তি দিয়ে রাজাকে আবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

বৈনাকের পরই রয়েছে সিংহ। সিংহ অবশ্য বলেছে রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে তার আপত্তি আছে, কেননা তার মতে সিংহাসনে বসতে পারে একমাত্র সিংহ। তবে মানুষের রাজা হওয়ার বাসনা সিংহের নেই। কেননা মানুষ খুবই গোলমেলে প্রাণী। তারা এক একটা এক এক রকমের হয়। কোনটা হয় চোর, কোনটা হয় সাধু, কোনটা খায় মাছ, কোনটা খায় ফলমূল, কোনটা চায় কম, কোনটা চায় বেশি। কোনটা হাসে, কোনটা কাঁদে—আবার একই মানুষ সকালে একরকম বিকেলে আর একরকম। সেজন্য মানুষের রাজা হতে গেলে নানা প্যাঁচোয়া বুদ্ধি লাগে যা কিনা সিংহের নেই।

সিংহ হচ্ছে সরল, সাধারণ। খিদে পেলে খায় খিদে না পেলে নয়। সিংহ বলেছে, মানুষ হয়ে সে সিংহাসনে কেন বসবে, মানুষ বসবে— মানুষাসনে। মানুষ সিংহের মূর্তি গড়িয়ে বাইরের দরজার দুপাশে লোককে ভয় দেখানর জন্য রেখে দেয়—এটাও খুব খারাপ ব্যাপার! সিংহ কি ভয় দেখানর মতো প্রাণী? সিংহ তাই বলেছে বৈনাক রাজা হলে তাকে একটা উঁচু আর ভারি কাঠের আসন তৈরি করে দেওয়া হবে, কিন্তু তাতে কোনো সিংহর মূর্তি খোদা থাকবে না।

কিন্তু এতেও গাছেদের তরফ থেকে আপত্তি উঠেছিল। একটা বড় গাছ বলেছিল, আমাদের কেটে আমাদের দিয়ে তৈরি কোনো কিছুই নতুন রাজাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, কেবল সেই শর্তেই গাছেরা এই অভিযানে সাহায্য করবে, নয়ত নয়। পরে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে গাছেদের রাজি করানো হল, বলা হল কোনো জীবিত গাছ কেটে আসন করা হবে না, বা খাট চেয়ার পালঙ্ক কোনো কিছুই বানানো হবে না। এই শর্ত মেনে নেওয়ায় গাছেরা আনন্দে সায় দিয়েছিল।

গাছেরা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকলে বৈনাককে নেতা মেনে নিল। অভিযানের দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল। মানুষেরা যখন জানল তাদের আবার ফিরে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদের সাহায্যের জন্যই এই অভিযান তখন বহু মানুষও এই অভিযানে যোগ দিল।

গোপনে এসব করা হলেও কিন্তু গোলাপকুমার এই অভিযানের কথা আগেই জানতে পেরে গেল।

জানতে পেরে গেল, কেননা ইঁদুর গিয়ে বলে এল সমস্ত যোগাড়-যন্তরের কথা। গোলাপকুমার একথা ইঁদুরের কাছে জানতে পেরে তাকে দিল এক খাবলা চীজ আর এক ডেলা মিষ্টি।

ইঁদুর খুশি হয়ে ফিরে এল।

গোলাপকুমার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

হাজার হাজার সৈন্য রাজধানীর চারদিকে পাহারা বসালো।

বৈনাকের নেতৃত্বে প্রথমে হাজার সৈন্য এসে রাজধানী আক্রমণ করল। কিন্তু তারা নিদারুণভাবে হেরে গেল। হাজারের মধ্যে তুশোর উপর সৈন্য মারা পড়ল, কয়েকশো আহত হল, আর বাকীরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

তারা বলল, বাপরে কী প্রচণ্ড বাধা! রাজধানীতে ঢোকাই গেল না!

কিন্তু যারা বেঁচে রইল তারা কিন্তু আর বৈনাকের কাছে ফিরে গেল না। তারা কোথায় যে সব পালাল তার হিসেবও কেউ করতে পারল না।

বৈনাক চিন্তিত হল।

এর পর সে পাঠাল আবার এক হাজার সৈন্য। এবারে সৈন্যরা ভীত, সন্ত্রস্ত। এর আগের সৈন্যদের কেউ ফিরে আসেনি সেটা ভাদের ভাবিয়ে তুলছে।

তা ছাড়া আরও সব আছে। কিছু সৈন্য যুদ্ধ যাতে না করতে হয় সে জন্য অন্য সৈন্যদের কাছে গিয়ে বলল, আমরা কেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছি?

একজন সৈন্য বলল, কেন—আমরা পুরনো আর আইনসঙ্গত রাজাকে রাজার আসনে বসাব।

তখন প্রথম দলের সৈন্যরা বলল, কিন্তু এই যুদ্ধে তো আমাদের মৃত্যু হতে পারে।

দ্বিতীয় দল উত্তর দিল, নিশ্চয় মৃত্যু হতে পারে।

—তবে?

দ্বিতীয় দল বলল, আমরা যে ভাবে রয়েছি তাতেও খুব ভাল আছি কি? জঙ্গলে রয়েছি—কতরকম অসুবিধে। এর চাইতে যদি আবার আমরা ফিরে যেতে পারি আমাদের নিজের জায়গায়—তাহলে কত ভাল হয়!

কিন্তু বললে হবে কি, সৈন্যদলে আর কেউ যেতে চায় না। শেষে

এক ঝাঁক মৌমাছি এসে বৈনাককে বলল, আমাদের একটা পরামর্শ শুনবেন মশাই ?

বৈনাক বলল, কী পরামর্শ ? পরামর্শ ঠিক মত হলে তা নিশ্চয়ই শুনব।

মৌমাছি বলল, যা মানুষে পারে না তা আমরা পারি।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ মৌমাছির দল আপনাকে আপনার জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বৈনাক বলল, বুঝেছি। মানুষকে দেখা যায়—মানুষকে দেখে অন্য মানুষ আক্রমণ করতে পারে—কিন্তু মৌমাছির দল একবার ঢুকলে তার বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না।

মৌমাছির দল বলল, ঠিক ধরেছেন। আমরা হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছব—আর কামড়ে কামড়ে গোলাপকুমার আর তার দলবলকে অস্থির করে তুলব !

এমন সময় এল একদল পিঁপড়ে। তারা বলল, হুজুর আমরাও আপনাকে সাহায্য করতে চাই।

বৈনাক বলল, তোমরাও কামড়ে কামড়ে গোলাপকুমার আর দলবলকে অস্থির করে তুলবে তো ?

পিঁপড়েরা বলল—আলবত !

বুড়ো বলল, গল্পটা শেষ হয়েছিল কী ভাবে জানো ?

ভোঁদড় বলল, ভুলে গেছি।

বুড়ো বলল, ভুলে যাওনি, কেননা আমার গল্পের শেষটা বলাই হয়নি। সে অতি দুঃখের কথা।

ভোঁদড় বলল, কেন বৈনাককে বলে তারপর মৌমাছি আর পিঁপড়ের দল বুঝি কথা রাখেনি ?

বুড়ো বলল, কথা রেখেছিল তারা। দুদিনের যুদ্ধে গোলাপকুমার

আর তার দলবল হয়ে গিয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। তারপর বৈনাক হয়েছিল রাজা।

ভোঁদড় বলল, তাহলে তো খুবই ভাল কথা। সব ভাল, যার শেষ ভাল!

বুড়ো বলল, গল্প তো সেখানেই শেষ হয়নি।

—তবে?

বুড়ো বলল, তবে শোনো।

বুড়ো বলতে শুরু করল:

শেষ পর্যন্ত হাজার মৌমাছি আর হাজার হাজার পিঁপড়ের প্রাণ গেল বটে এবং বৈনাকও রাজা হল বটে, কিন্তু যা ভাবা গিয়েছিল তা আর হল না। মানুষেরা জঙ্গলে গিয়ে বিনি পয়সায় সব জিনিসপত্র পেয়ে দেশে ফিরে যেতে চাইল না। না, তা ঠিক নয়—এক একটা বাড়িতে যদি চারজন মানুষ, তো দুজন রইল বনে, দুজন চলে গেল নিজের রাজ্যে। ফলে জঙ্গল রোজ কাটা পড়তে লাগল, বনের ফল হতে লাগল লুঠ, বনের ফুলে মৌমাছিরা আর ভাগ বসাতে পারল না। পিঁপড়েরাও খাদ্য পেল না। জঙ্গলের খরগোশরা গেল সব মানুষের পেটে। মানুষের পেটে গেল দলে দলে হরিণ আর নীলগাই। শেষে বাঘ সিংহ এরা সব শিকার না পেয়ে কেউ কেউ গেল মরে, কেউ কেউ গেল ক্ষেপে।

ভোঁদড় বলল, তাই নাকি?

বুড়ো বলল, এবারে বুঝেছ তো যে তোমার একটা গর্ত খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়!

ভোঁদড় বলল, আপনি একটা জিনিস বোঝেননি।

বুড়ো বলল, কি?

ভোঁদড় বলল, অন্যান্যদের লক্ষ লক্ষ টাকার চাইতে আমার নিজের একটা পয়সার দাম অনেক বেশি। আমার একটা পয়সা

হারানো আমার কাছে খুবই গুরুতর। অন্যেরা লক্ষ লক্ষ টাকা হারালে কি আমি আমার হারানো পয়সার ক্ষতিপূরণ পাই ?

বুড়ো বলল, তা তুমি এখন কি করতে চাও ?

ভোঁদড় বলল, আমি একটা গর্ত চাই। যে গর্ত থেকে কেউ আমাকে তাড়িয়ে দেবে না।

বুড়ো বলল, ঠিক আছে—আমি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব।

একথা শুনে ভোঁদড় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগল।

তারপর ?

তারপর কী হল তা আমার জানা নেই। তা তোমরা এর পর যখন কোনো ভোঁদড়ের দেখা পাবে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো তারপর কী হয়েছিল !